শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জাতীয় পত্রিকা

গোলাঘর

৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা এপ্রিল - জুন ২০১৪

প্রকাশকাল
১৫.০৩.২০১৫

সম্পাদক
শওকত হোসেন
শরমিন নিশাত

যোগাযোগ
বাবুল অডিও
১৩৭, আজিজ সুপার মার্কেট, নিচতলা শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৭২০৫৮৭৭২৭, ই-মেইল: golaghor@yahoo.com

বানান সমন্বয়
ফরীদুল আলম

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
কাইয়ুম চৌধুরী

পত্রিকার নামলিপি
শরমিন নিশাত

প্রচ্ছদ অংকন
রুবাবা হোসেন নদী

কম্পোজ
প্রান্তিক

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
১০০.০০ টাকা
১০০.০০ রুপি
৩ $ ডলার

স ম্পা দ কী য়

পয়লা বৈশাখের এই ধরনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছিল জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের বাড়ির আশপাশের জায়গটুকু থেকে–রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগেই– পরে তা ঢাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু হয় রমনার বটমূল থেকে– ।

আজ তা ছড়িয়ে পড়েছে শাহবাগ থেকে ফার্মগেট, মতিঝিল, সদরঘাট এবং ধানমণ্ডি হয়ে রায়েরবাজার পর্যন্ত । এর ছোঁয়া লেগেছে অন্য বিভাগীয় শহর, জেলা শহর এমনকি গ্রাম অবধি । এবার শাহবাগে যে জমায়েত দেখা গেল, এতোটা অতীতে কখনো দেখিনি । সুতরাং অতি সাধারণ আর মধ্যবিত্তের এবারের এই অতি-জমায়েত বিশেষ বার্তা বহন করছে । একদিকে দাগী রাজাকারদের বিচার সম্পন্ন হচ্ছে অন্যদিকে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে পয়লা বৈশাখের উৎসবে সমাগম বাড়ছে । বাঙালির হৃদয়ের প্রকৃত চাওয়াটাই গতি পাচ্ছে ।

আমাদের নববর্ষ; একটি গোষ্ঠী এই সংস্কৃতিকে মনে করে হিন্দুদের । রমনার বটমূলে বোমা মেরে নারী-পুরুষের এই যৌথ জমায়েত স্তব্ধ করা যায়নি তাই 'শ্লিলতাহানী' হতে পারে তাদেরই পরিকল্পিত পদক্ষেপ । এর মাধ্যমে যদি এই উৎসবের গায়ে কালি লেপন করা যায়, ওই গোষ্ঠী মনে করে থাকতে পারে– তাহলে হয়তো অনেকেই এই উৎসবে আর আসবে না । বাস্তবতা হলো, বটমূলের অনুষ্ঠানে বোমা মারার পরের বছর জমায়েত কিছুটা কম হলেও তার পরের বছর থেকে জমায়েত অনেক গুণে বেড়ে গেছে ।

আরেকটি বিষয় হলো, প্রতি মুহূর্তে প্রিন্ট আর ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কোমলমতি তরুণ-তরুণীদের মধ্যে যৌনতাকে উসকে দিয়ে ব্যবসায় করা হচ্ছে । স্কুল-কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মোবাইলের বাটন টিপলেই পর্ণ-ভিডিও । মোবাইল কোম্পানীগুলো রমরমা ব্যবসায় করছে 'যৌন-প্যাকেজ' দিয়ে । তরুণ-তরুণীদের সামনে মেলে ধরা আছে হলিউড-বলিউড আর ইন্টারনেটে ওপেন সেক্সের দিবানাট্য । অন্যদিকে তাদেরকে বাস করতে হচ্ছে একটি কট্টর মুসলমানী সমাজে । আমরা কি বুঝতে পারছি, এই বৈপরিত্য শারীরীক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের কতটা পরিপন্থী! যা সমাজে জন্ম দিচ্ছে চরম বিকৃতি । বিকৃত একটি সমাজ সৃষ্টির যতোগুলো প্রক্রিয়া আমরা জারি রাখছি, তার থেকে ঐ পরিমান 'কদাচার রিটার্ন' পাওয়ার জন্য আমরা কি প্রস্তুত? বুনে-রাখা সেই কদাচারের বীজ থেকেই সামনে ফল হিসেবে আসছে এই পশুপনা, 'শ্লিলতাহানী', যার বিচার হওয়া দরকার, কিন্তু বিচারই সমাধান নয় । অসুখ হয়েছে রাষ্ট্রের, ওরও চিকিৎসা প্রয়োজন । প্রতিহত করা দরকার সব ধরনের দালালদের ।

সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগী সবাইকে জানাই কৃতজ্ঞতা ।

শওকত হোসেন
প্রধান সম্পাদক, গোলাঘর
১৫.০৩.২০১৫

সূচি

স্ম র ণ

ছবি: গোবিন্দচন্দ্র দেব ০৪

স্ম র ণ / প্র ব ন্ধ

দার্শনিক গোবিন্দচন্দ্র দেব : জীবন ও কর্ম

প্র দী প রা য় ০৫

বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাসকে নিয়ে নজরুলের কবিতা

এ ম এ আ জি জ মি য়া ২০

পূর্ণ-অভিনন্দন [কবিতা/গান]

কা জী ন জ রু ল ই স লা ম ২২

সা ক্ষা ৎ কা র

বিশ্বে পাট নিয়ে বিশাল সম্ভাবনার নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশ

মা ক সু দু ল আ ল ম ২৪

ক বি তা

সত্তর, আশি, নব্বই, প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের কবিতা **৩১**

গ ল্প

কাকমারা

শ ও ক ত হো সে ন ৭৩

অ নু বা দ / ক্ল্যা সি ক

হোমার ইলিয়াড

মা স রু র আ রে ফি ন ১৭৬

(স্মরণ)

গোবিন্দচন্দ্র দেব

১৯০৭ - ১৯৭১

দার্শনিক গোবিন্দচন্দ্র দেব: জীবন ও কর্ম

প্র দী প রা য়

আবহমান বাংলার ঐতিহ্যে লালিত আউল-বাউল, ফকির-দরবেশ, পীর-মুর্শিদ-ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, মন্দির-মসজিদ-গির্জা-বিহার ইত্যাদির সহাবস্থানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা গোবিন্দচন্দ্র দেব পুরকায়স্থ ইংরেজি ১৯০৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সিলেট জেলার বিয়ানী বাজারের পঞ্চখণ্ড পরগনার লাউতা গ্রামের সম্ভ্রান্ত 'দেব পুরকায়স্থ' পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে গোবিন্দ দেবের বড় ভাই বীরেন্দ্রচন্দ্র দেব পুরকায়স্থ, যিনি ভারতে পেশায় একজন সাংবাদিক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীকে ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্যকে ৮ মার্চ ১৯৭২ লেখেন, "We hail from village and post office– LAUTA, under Pargana Panchakhanda, Police Station Beani bazar, District Sylhet. We belong to the 'Deb Purkayastha' family of Panchakhanda." গোবিন্দ দেবের পূর্বপুরুষেরা খুব সম্ভবত কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মা কর্তৃক ব্রহ্মোত্তর লাভ করে পঞ্চম শতাব্দীতে পঞ্চখণ্ডে আগমন করেন। ভাস্কর বর্মা যাঁদের সিলেটে এনে ভূমি দান করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই গুজরাটি ব্রাহ্মণ। ড. ভাণ্ডারকারের মতে, গুজরাটের ব্রাহ্মণদের উপাধি দেব, সিংহ, পাল, পালিত ইত্যাদি। গুজরাটি ব্রাহ্মণগণ এখানে এসে ব্রাহ্মণ্যত্ব রক্ষা করতে না পেরে কায়স্থ হন। এভাবেই হয়তো গোবিন্দ দেবের পরিবার 'দেব পুরকায়স্থ' উপাধি গ্রহণ করেন। তাহলে দেখা যায় যে গোবিন্দ দেবের পরিবার প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত পরিবার। এখানে আসার পর তাঁরা নব উদ্যোগে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ চর্চা শুরু করেন। গোবিন্দ দেবের জন্মস্থান বহুকাল থেকেই আর্য সংস্কৃতির এক আবাসস্থল বলে স্বীকৃত। এখানে উল্লেখ্য যে, এ পঞ্চখণ্ডেরই সুপ্রসিদ্ধ তার্কিক রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

গোবিন্দচন্দ্র দেবের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র দেব পুরকায়স্থ। তাঁর মাতার নাম শরৎ সুন্দরী দেবী। তিনি দুবার বিয়ে করেন। ঈশ্বরচন্দ্র দেবের ছয় পুত্র ও এক কন্যাসন্তান। তাঁর পুত্রদের নাম যথাক্রমে অন্নদাচরণ দেব পুরকায়স্থ, পুলিন বিহারী দেব পুরকায়স্থ, বীরেন্দ্রচন্দ্র দেব পুরকায়স্থ, গোবিন্দচন্দ্র দেব পুরকায়স্থ, সত্যেন্দ্রকুমার দেব পুরকায়স্থ এবং হরিপ্রসাদ দেব পুরকায়স্থ। এবং কন্যার নাম সুকৃতি দেব পুরকায়স্থ। অন্নদাচরণ ও পুলিন বিহারীর শিক্ষা ও চাকরি সংক্রান্ত কোনো তথ্য জানা যায়নি। তবে বীরেন্দ্রচন্দ্র এম.এসসি পাস করে সাংবাদিকতার পেশা, সত্যেন্দ্রকুমার বি. কম পাস করে চাকরি এবং হরিপ্রসাদ একজন

স্নাতক প্রকৌশলী। তাঁরা সবাই ভারতে আছেন বলে জানা যায়। গোবিন্দ দেবের একমাত্র বোন সুকৃতি দেবের সিলেটের বিখ্যাত সেন পরিবারে বিয়ে হয়। ভাইদের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র দেব ছিলেন প্রথম পক্ষের চতুর্থ সন্তান। গোবিন্দ দেবের পরিবার ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির বহু পূর্বেই ভারতে চলে যান। এখানে লক্ষণীয় যে, দেব পরিবারের পারিবারিক 'পুরকায়স্থ' উপাধি তাঁরা কালক্রমে বর্জন করেন। এ প্রসঙ্গে গোবিন্দ দেবের পূর্ব উল্লিখিত বড় ভাই বীরেন্দ্রচন্দ্র দেব পুরকায়স্থ লেখেন, "Though I have retained the surname of 'Purkayastha', my other brothers, including Dr. Gobinda Chandra Dev, have dropped it altogether."

গোবিন্দচন্দ্র দেবের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র দেব পুরকায়স্থ ছিলেন অত্যন্ত সহজ-সরল মানুষ এবং পঞ্চখণ্ড পরগনায় তাঁদের বেশ বুনিয়াদি তালুক ছিল। কিন্তু তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত বিপর্যয়ের কারণে তাঁরা তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। ফলে পেশা হিসেবে সামান্য ব্যবসা শুরু করেন। তাঁর জীবনে তিনি এক মারাত্মক ভুল করে ফেলেন ঠিকাদারি ব্যবসা গ্রহণ করে। তিনি ইস্টার্ন বেঙ্গল এবং আসাম রেলওয়ের ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করেন। ইস্টার্ন বেঙ্গল এবং আসামের এই ঠিকাদারি ব্যবসাটি ছিল জুড়ী থেকে লাতু পর্যন্ত মাটিভরাট কাজের। এ কাজের আর্থিক পরিমাণ ছিল তৎকালীন প্রায় এক লক্ষ টাকার মতো। কিন্তু তাঁর সাব কন্ট্রাকটারগণ তাঁকে নানাভাবে ঠকাতে শুরু করেন। ফলে চুক্তি অনুযায়ী যে পরিমাণ কাজ হবার কথা তা না হওয়াতে তাঁকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, যার পরিমাণ ছিল তৎকালীন প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো। এই ক্ষতিপূরণের টাকা তিনি তাঁর জমিজমা, সহায়সম্বল বিক্রি করে পরিশোধ করেন। ফলে বসতবাড়ি ব্যতীত তাঁর আর কোনো কিছুই বাকি ছিল না। এমতাবস্থায় গোবিন্দ দেবের পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে পড়লে অন্যান্য জমিদারগণ বিশেষ করে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ভগ্নির শ্বশুর আবদুর রহিম চৌধুরী তাঁদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন এবং গোবিন্দ দেবের পিতাকে তাঁর তালুকের ম্যানেজারের দায়িত্বভার প্রদান করেন।

ঠিকাদারি ব্যবসায়ে দেউলিয়া ও সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ার কারণে গোবিন্দ দেবের পিতা ঈশ্বরচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙে যেতে থাকে এবং তিনি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েন। ১৯২৫ সালে গোবিন্দ দেবের বয়স যখন আনুমানিক আঠার বছর তখন তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন। পিতার অকালমৃত্যুর পর তাঁদের সংসারের দায়িত্বভার গোবিন্দ দেবের ওপর এসে পড়ে বলে জানা যায়।

শিক্ষাজীবন

গোবিন্দ দেব তাঁর নিজস্ব গ্রাম লাউতায় অবস্থিত 'লাউতা বালক বিদ্যালয়'-এ প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শুরু করেন। সে সময়ে লাউতা বালক বিদ্যালয় ও লাউতা বালিকা বিদ্যালয় স্বতন্ত্র ছিল। 'নানকার বিদ্রোহ' গ্রন্থের লেখক অজয় ভট্টাচার্য-এর আত্মীয় রাজেন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়িতেই তখন লাউতা বালক বিদ্যালয়ের অবস্থান ছিল। রাজেন্দ্র ভট্টাচার্য ঐ বিদ্যালয়ে গোবিন্দ দেবের শিক্ষক ছিলেন। গোবিন্দ দেবের বাড়ির খুব কাছেই ঐ বিদ্যালয়টি ছিল। অন্যদিকে লাউতা বালিকা বিদ্যালয়টির অবস্থান ছিল গোবিন্দ দেবের বাড়িতে। বালিকা

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন মর্তুজা খাতুন এবং সহকারী শিক্ষয়িত্রী ছিলেন গোবিন্দ দেবের সমসাময়িক ও বর্তমানে জীবিত ডা. লক্ষ্মীকান্তের ভাইয়ের কন্যা মীনা রানী পাল।

লাউতা গ্রামে গোবিন্দ দেব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে সাভার বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান ও গবেষক সিলেটের বড়লেখার অধিবাসী কালীপ্রসন্ন দাস উক্ত ডা. লক্ষ্মীকান্ত পাল ও গোবিন্দ দেবের অন্য একজন সমসাময়িক, বর্তমানে লাউতা গ্রামের অধিবাসী হাজী মোহাম্মদ আমীর উদ্দিনের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন যে, গোবিন্দ দেব ছোটবেলায় অত্যন্ত দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিলেন। গোবিন্দ দেবের বিদ্যালয়-পালানোর স্বভাবও ছিল। বিদ্যালয়ে যাবার নাম করে গোবিন্দ দেব বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাশের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতেন। গোবিন্দ দেবের শিক্ষক রাজেন্দ্র ভট্টাচার্যও গোবিন্দ দেব সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ডা. পালকে এ কথাই বলেন। রাজেন্দ্র ভট্টাচার্য আরও জানান যে, তাঁর জীবনে তিনি দুজন মানুষের যুগান্তকারী পরিবর্তন লক্ষ করেছেন। তাঁদের একজন গোবিন্দ দেব, অন্যজন হচ্ছেন শ্যামাকান্ত– যিনি পরবর্তীকালে আসামের এমএলএ হয়েছিলেন। তৎকলীন লাউতা বালক ও বালিকা বিদ্যালয় ১৯৬৭ সালের দিকে একত্রিত হয়ে বর্তমানে লাউতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তর হয়। এই সরকারি বিদ্যালয়টি গোবিন্দ দেবের বাড়ির সামনেই অবস্থিত।

লাউতা বালক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে গোবিন্দ দেব তাঁর বাড়ি থেকে অর্ধ মাইল দূরে ১৮৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত ২৬৫ নং লাউতা মৌজায় 'মধ্য ইংরেজি স্কুল'-এ ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তখন এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন দিগেন্দ্র কুমার দাস এবং প্রধান পণ্ডিত ছিলেন উক্ত অজয় ভট্টাচার্যের জ্যাঠা মহাশয় গিরিজা ভট্টাচার্য। এ বিদ্যালয়টি ১৯৬৩ সালে লাউতা হাই স্কুলে রূপান্তর হয়। গোবিন্দ দেব মধ্য ইংরেজি স্কুল থেকে পড়াশুনা শেষ করে লাউতা থেকে চার মাইল দূরবর্তী 'পঞ্চখণ্ড হরগোবিন্দ উচ্চ বিদ্যালয়'-এ ১৯২১ সালে ভর্তি হন এবং ১৯২৫ সালে উক্ত স্কুল থেকে সংস্কৃত ও অঙ্কে লেটারসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সরকারি বৃত্তি লাভ করেন।

১৯২৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর গোবিন্দ দেব তাঁর বড় ভাই বীরেন্দ্রচন্দ্র দেব পুরকায়স্থের নিকট কোলকাতায় চলে যান। তাঁর বড় ভাই তখন কোলকাতায় একটি জীবন বীমা অফিসে চাকরি করতেন। এই বড় ভাইয়ের কাছ থেকেই তিনি ১৯২৫ সালে কোলকাতার রিপন কলেজে (বর্তমানে স্যার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) আইএ ক্লাসে ভর্তি হন। অসাধারণ মেধা ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি রিপন কলেজ থেকে ১৯২৭ সালে যুক্তিবিদ্যায় লেটারসহ প্রথম বিভাগে আইএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২৫ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত রিপন কলেজের ছাত্র থাকাকালে গোবিন্দ দেব রামকৃষ্ণ মিশন এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। এ দুটি পবিত্র স্থান থেকে তিনি তাঁর শিক্ষাজীবনে পৃষ্ঠপোষকতা ও পরবর্তী দার্শনিক চিন্তাধারা গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

১৯২৭ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে আইএ পাস করে গোবিন্দ দেব ঐ বছর কোলকাতার সংস্কৃত কলেজে বিএ সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি হন। এ কলেজেও গোবিন্দ দেব তাঁর মেধা এবং তীক্ষ্ণ ও গভীর চিন্তাশক্তির পরিচয় দেন। তাঁর মেধা, গভীর চিন্তা ও অধ্যবসায়ে সংস্কৃত

কলেজের অধ্যক্ষ, ভারতীয় দর্শন-বিশেষজ্ঞ ড. সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেন। ড. সুরেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণা তাঁকে একদিকে যেমন ভারতীয় দর্শন তথা দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করে তেমনি তাঁর পড়াশুনায় উৎসাহ ও আগ্রহের সৃষ্টি হয়। এই সংস্কৃত কলেজ থেকেই তিনি ১৯২৯ সালে দর্শনশাস্ত্রে দ্বিতীয় শ্রেণিতে বিএ সম্মান ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯২৯ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে দ্বিতীয় শ্রেণিতে বিএ সম্মান পাস করার পর গোবিন্দ দেব ঐ বছরই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে এমএ শ্রেণিতে ভর্তি হন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সময় তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত দার্শনিক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ড. হীরালাল হালদার, কেসি ভট্টাচার্য, ড. মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ দার্শনিকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভ করেন। তাঁদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় গোবিন্দ দেব গভীরভাবে দর্শন অধ্যয়ন ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৩১ সালে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করে এমএ ডিগ্রি লাভ করে ‘বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপদক’ ও ‘হেমচন্দ্র মুখার্জি’ রৌপ্যপদক লাভ করেন।

১৯৩৪ সালে গোবিন্দ দেব উচ্চতর শিক্ষা তথা গবেষণা করার জন্য ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশের জালগাঁও জেলার অন্তর্গত আমলনারের বিশ্ববিখ্যাত দর্শন গবেষণা কেন্দ্র Pratap Centre of Philosophy-তে বৃত্তি নিয়ে গমন করেন। সে সময় এই গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, সংক্ষেপে কেসি ভট্টাচার্য। এই কেসি ভট্টাচার্য ভারতের Greatest Dialectician বলে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। দর্শনে সুপণ্ডিত, মৌলিক চিন্তার অধিকারী এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই কেসি ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে গোবিন্দ দেব ভারতীয় দর্শন বিশেষ করে বেদান্ত দর্শনে গবেষণা শুরু করেন। আমলনারে প্রায় দেড় বছরকালে গবেষণা করার পর ১৯৩৭ সালের দিকে তিনি কোলকাতায় ফিরে আসেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে গোবিন্দ দেব দিনাজপুরে অবস্থানকালে Reason, Intuition and Reality শিরোনামে একটি অভিসন্দর্ভ রচনা করেন এবং ১৯৪৪ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে উক্ত অভিসন্দর্ভের জন্য চয.উ. ডিগ্রি প্রদান করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গোবিন্দ দেবের অভিসন্দর্ভের পরীক্ষক ছিলেন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নের কৃতী শিক্ষক ও ভাববাদী দার্শনিক হরিদাস ভট্টাচার্য।

কর্মজীবন

১৯৩১ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এমএ পাস করার পরপরই গোবিন্দ দেব রিপন কলেজে দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ইতোমধ্যে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধের দাবানল কোলকাতায় ছড়িয়ে পড়ে এবং কোলকাতার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। এমতাবস্থায় কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজটিকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের কথা চিন্তা করে কলেজটিকে বর্তমান বাংলাদেশের

দিনাজপুরে স্থানান্তর করেন। গোবিন্দ দেবও চলে এসে ঐ কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে কলেজটিকে পুনরায় কোলকাতায় স্থানান্তর করা হয়। দিনাজপুরে স্বল্পকাল স্থায়ী কলেজটিকে তিনি পূর্ণরূপ দেবার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সকলের সহযোগিতায় কলেজটিকে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ নামে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি নিজেই কলেজটির অধ্যক্ষ-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আর সে সূত্রেই তিনি কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। গোবিন্দ দেবের আন্তরিক শ্রম ও সুদক্ষ পরিচালনার জন্য কলেজটি স্বল্প সময়ের মধ্যেই একটি প্রথম শ্রেণির কলেজে উন্নীত হয়। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের জন্য গোবিন্দ দেবের অবদান প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. অজয় রায় বলেন, 'জন্মসূত্রে তিনি (দেব) দিনাজপুরের অধিবাসী নন– অথচ দিনাজপুরকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন নিজের বলে; দিনাজপুরবাসীকে ভালোবেসেছেন, হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। দিনাজপুরবাসীরাও তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন ভালোবাসা দিয়ে। মনে পড়ে পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। দিনাজপুরের একমাত্র কলেজের তখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা– বিশেষ করে কলেজের আর্থিক প্রেক্ষিতে। মাঝে মাঝে দেখতাম বাবা [ড. অজয় রায়ের পিতা] বাড়ি থেকে চলে যেতেন বেশ কয়েকদিনের জন্য। মা'র [ড. অজয় রায়ের মা] কাছে শুনতাম অধ্যাপক দেব বাবাকে নিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরছেন কলেজের জন্য টাকা তুলতে। ...বাবার কাছে শুনেছি – ডক্টর দেব গ্রামে, গঞ্জে, হাটে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে কলেজের জন্য 'তহবিল' গড়ে তুলতে সভা সমিতি করেছেন। শুধু টাকাপয়সা তুলেই ক্ষান্ত হননি, দিনাজপুরবাসীদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার জন্য দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছেন, উৎসাহ জুগিয়েছেন। দিনাজপুরের 'সুরেন্দ্রনাথ কলেজ' তাঁরই অবদান। তিনি এর শুধু আনুষ্ঠানিক অধ্যক্ষ ছিলেন না, ছিলেন কলেজের প্রাণ, কলেজের হৃদয়। তিনি ঐ কলেজকে কেন্দ্র করে অনেক স্বপ্ন দেখতেন– স্বপ্ন দেখতেন কলেজকে একদিন উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠতম বিদ্যাপীঠ হিসেবে গড়ে তুলতে, বিশ্ববিদ্যালয় রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে। স্বপ্ন দেখতেন দর্শনশাস্ত্রের, বিশেষ করে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের তীর্থভূমি হবে দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজ।' গোবিন্দ দেব ১৯৪৬ সালের ১ জুলাই থেকে ১৯৫৩ সালের ২১ জুলাই পর্যন্ত এই কলেজের বিনা ভাড়ায় বাড়িসহ পাঁচশত টাকা বেতনে অধ্যক্ষের দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর ব্যাপক সংখ্যক হিন্দু শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ত্যাগ করে ভারতে চলে যান। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাব দেখা দেয়। ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে শিক্ষকসংকট দেখা দিলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জাতীয় পরিষদ সদস্য ও মন্ত্রী হাসান আলী আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে গোবিন্দ দেবের কথা জানান এবং তাঁরই অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে গোবিন্দ দেব ১৯৫৩ সালের ২২ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। গোবিন্দ দেবের বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে যোগদান এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে দর্শন বিভাগে কৃতী অধ্যাপক হিসেবে যাঁরা যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জিএইচ ল্যাংলি, হরিদাস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জিলানী প্রমুখ। এঁরা যে নঞর্থক দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শনচর্চা শুরু

করেছিলেন সে ক্ষেত্রে গোবিন্দ দেব নতুন ধারা অবলম্বন করে গঠনমূলক দর্শনচর্চার পথ সুপ্রশস্ত করেন। এবং তাঁর সময় থেকেই দর্শন বিভাগে গঠনমূলক দর্শনচর্চা শুরু হয় যা আজ পর্যন্ত তাঁর স্নেহভাজন ছাত্র ও সহকর্মীবৃন্দ, যেমন, ড. আবদুল মতীন, ড. আমিনুল ইসলাম, ড. আবদুল জলিল মিয়া, ড. নীরুকুমার চাকমা, ড. হাসনা বেগম, ড. আনিসুজ্জামান প্রমুখ অব্যাহত রেখেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে যোগদানের পর থেকে গোবিন্দ দেব পূর্ণ উদ্যমে গবেষণা শুরু করেন এবং বেশ কয়েকটি গ্রন্থসহ অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেন যা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

গোবিন্দ দেবের ব্যক্তিগত নথি থেকে দেখা যায় যে, তিনি ১৯৬২ সালের ২৮ মে তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের রিডার পদের জন্য আবেদন করেন এবং ঐ বছর ১ আগস্ট থেকে রিডার পদে উন্নীত হন। ১৯৬২ সালে বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক জিলানী পাকিস্তানের লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১২ সেপ্টেম্বর তিনি উপাচার্যকে জানান যে, তিনি ১৫ সেপ্টেম্বর বিভাগীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করবেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি ড. গোবিন্দ দেবকে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করার সুপারিশ করেন। অধ্যাপক জিলানীর উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৬২ সালের সিন্ডিকেটের ৬ অক্টোবরের সভায় গোবিন্দ দেবকে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বের তারিখ হতে, অর্থাৎ, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সাল থেকে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৬২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব চালিয়ে যাবার পর ১৯৬৪ সালের ২০ ডিসেম্বর তিনি দর্শন বিভাগের অধ্যাপক পদের জন্য আবেদন করেন। অধ্যাপক পদের আবেদনপত্রে তিনি যে শ্রেণিতে এবং যে বিষয়ে পড়াতেন বলে উল্লেখ করেন তা হল : এমএ শ্রেণিতে অধিবিদ্যা (প্রাচীন, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ), সমকালীন যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন এবং ভারতীয় দর্শন এবং রেফারেন্স হিসেবে যে দুজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন তাঁরা হলেন মি. জাস্টিস এস এ মুর্শেদ, প্রধান বিচারক, পূর্ব পাকিস্তান এবং অধ্যাপক এম এম শরীফ, সভাপতি, পাকিস্তান ফিলোসফিক্যাল কংগ্রেস। গোবিন্দ দেবের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং সিলেকশন কমিটির ১৯৬৫ সালের ৩১ মে তারিখের সিদ্ধান্ত অনুসারে সিন্ডিকেটের ১৯৬৫ সালের ৫ জুন তারিখের সভায় গোবিন্দ দেবকে দর্শন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দান করা হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি গোবিন্দ দেব হল প্রশাসনের দায়িত্বও কৃতিত্ব এবং দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এক সময় ঢাকা হল ও জগন্নাথ হল যুগ্মসত্তায় ছিল। জগন্নাথ হলের প্রাক্তন প্রাধ্যক্ষ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. রংগলাল সেন এ ব্যাপারে লিখেছেন, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা সামলানোর আগেই ১৯৪৭ সালে এ উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে স্বতন্ত্র দুটি রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিপুল সংখ্যক অমুসলমান ছাত্র ও শিক্ষকের বাস্তুত্যাগ ঘটে। অর্থাৎ জগন্নাথ হল ও ঢাকা হলের (যে দুটি হল ছিল কার্যত অমুসলমান ছাত্রদের আবাস) ছাত্রসংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস পায়। তাই যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে ১৯৪৬ ইংরেজির আগস্ট মাসে ঢাকা হল থেকে জগন্নাথ হলের

ছাত্ররা তাদের হলে ফিরে আসে তবু তার এক বৎসরের মধ্যে দেশবিভাগের কারণে জগন্নাথ হলের পরিধি পুনরায় সংকুচিত হয়। ১৯৪৭ ইংরেজির আগস্ট মাসে হলের দালানগুলো সরকার অধিগ্রহণ করেন। ছাত্রদের (তখন মোট সংখ্যা ছিল ১৩০, তন্মধ্যে মাত্র ৩৮ জন আবাসিক) আবার ঢাকা হলে পাঠানো হয়; প্রভোস্ট অফিস প্রভোস্টের বাসভবনের নিচতলায় স্থানান্তরিত হয়। এর ফলে ১৯৪৮ সালের আগস্টে ঢাকা হল ও জগন্নাথ হল অভিন্ন প্রভোস্টের প্রশাসনে চলে যায়। ঢাকা হলের সাথে জগন্নাথ হলের এই সহাবস্থান কিংবা জগন্নাথ হলের স্বতন্ত্র অস্তিত্বহীনতা ১৯৫৭ ইংরেজির ৩০ জুন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তখন ঢাকা ও জগন্নাথ হলের ছাত্ররা ঢাকা হলের পশ্চিমার্ধে একত্রে বসবাস করে। কিন্তু কাগজপত্রে উক্ত দুই হলের ছাত্ররা স্ব স্ব হলের ছাত্র হিসেবে একজন প্রভোস্টের প্রশাসনাধীন থেকে নামমাত্র নিজ নিজ হলের অস্তিত্ব বজায় রাখে। ... ঢাকা-জগন্নাথ হলের গৃহশিক্ষক ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব ১৯৫৬ ইংরেজির ৩ মার্চ থেকে ১৯৫৭ ইংরেজির ৩০ জুন পর্যন্ত ঢাকা-জগন্নাথ হলের সর্বশেষ যৌথ ভারপ্রাপ্ত প্রাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।' তিনি আরো জানান, '... বেশ কয়েক বৎসর ঢাকা হলের সাথে জগন্নাথ হল যুক্ত থাকার পর ১৯৫৭ সালের ১ জুলাই জগন্নাথ হল তার স্বতন্ত্র সত্তা ফিরে পায়। পুনর্জন্মপ্রাপ্ত জগন্নাথ হলের প্রথম স্থায়ী প্রভোস্ট হচ্ছেন শ্রীহট্ট নিবাসী দর্শন বিভাগের রিডার [দেব ১৯৬২ সালের ১ আগস্ট রিডার পদ লাভ করেন] ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব। ধারাবাহিকতার দিক থেকে তাঁকে জগন্নাথ হলের সপ্তম স্থায়ী প্রভোস্ট বলা যায়। গোবিন্দ দেব ১৯৭০ ইংরেজির ২০ এপ্রিল পূর্বাহ্ণ পর্যন্ত জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জগন্নাথ হলের পুনর্জীবনের সাথে গোবিন্দ দেবের নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।' অধ্যাপক রংগলাল সেনের উপরিউক্ত বক্তব্যের সঙ্গে গোবিন্দ দেবের ব্যক্তিগত নথি ও জগন্নাথ হলে রক্ষিত প্রাধ্যক্ষদের নামের তালিকার সামঞ্জস্য রয়েছে। গোবিন্দ দেবের ব্যক্তিগত নথি ও জগন্নাথ হলে রক্ষিত প্রাধ্যক্ষদের নামের তালিকার যে তথ্য রয়েছে তা হল যে, গোবিন্দ দেব ৩ মার্চ ১৯৫৬ সাল থেকে ৩০ জুন ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা-জগন্নাথ হলের যুগ্ম সত্তার প্রাধ্যক্ষ ছিলেন। এরপর জগন্নাথ হল স্বতন্ত্র সত্তায় ফিরে এলে গোবিন্দ দেব পুনরায় ১ জুলাই ১৯৫৭ সাল থেকে ৩০ জুন ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত একনাগাড়ে জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। আরো জানা যায় যে, গোবিন্দ দেব ১ জুলাই ১৯৬৬ সাল থেকে ১ এপ্রিল ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত বিদেশ গমন উপলক্ষে ছুটি গ্রহণ করেন এবং ঐ সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য ভারপ্রাপ্ত প্রাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ছুটি শেষে গোবিন্দ দেব পুনরায় ২ এপ্রিল ১৯৬৭ সাল থেকে ২০ এপ্রিল ১৯৭০ সালের পূর্বাহ্ণ পর্যন্ত জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

গোবিন্দ দেবের রচনাবলি

গোবিন্দ দেব তাঁর কর্মজীবনে সর্বমোট ৯টি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থগুলোর মধ্যে দুইটি বাংলায় ও বাকি সাতটি ইংরেজিতে। এ ছাড়া দেশি-বিদেশি বহু জার্নালে বাংলা ও ইংরেজিতে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। জানা যায়, তিনি বিভিন্ন সময়ে রেডিওতে দর্শন

বিষয়ে অনেক বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। নিম্নে গোবিন্দ দেবের প্রকাশিত গ্রন্থাবলির একটি তালিকা এবং সেগুলোর সারসংক্ষেপ প্রদান করা হল :

১. Idealism and Progress প্রকাশক : দাসগুপ্ত এন্ড কোম্পানী লিঃ, ৫৪-৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশকাল : জুন ১৯৫২। গ্রন্থটি গোবিন্দ দেবের পি-এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ যার মূল শিরোনাম Reason, Intuition and Reality. দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করার সময়ে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে গোবিন্দ দেব তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারার মূলবক্তব্য তুলে ধরেন। এর পরবর্তী গ্রন্থগুলোর বক্তব্য উপরিউক্ত মূলগ্রন্থেরই বিশদ ও বিস্তারিত বিবরণ। এ গ্রন্থে গোবিন্দ দেব চিরায়ত ভাববাদের সমালোচনা করে ভাববাদকে নতুন আঙ্গিক ও দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর মতে জগৎ ও জীবনকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে, অর্থাৎ, বস্তুবাদী ও ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই আমাদের উন্নতি সম্ভব। অর্থাৎ, একটি সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি জীবনকে পূর্ণাঙ্গরূপে গড়ে তুলতে সক্ষম। গ্রন্থটি শ্রী রামকৃষ্ণের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

২. Idealism: A New Defence and A New Application. প্রকাশক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকাশকাল : ১৯৫৮। ঢাকাস্থ ইউসিসের তৎকালীন সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা ডেভিড গার্থ গ্রন্থটির একটি মুখবন্ধ লিখেছেন। গ্রন্থটিতে গোবিন্দ দেব তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থের জটিল বিষয়গুলোকে সহজ-সরল ভাষায় বর্ণনা করে দর্শনের ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা-পর্যালোচনা করে আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তা বিবেচনা করেছেন। গ্রন্থটি তাঁর ‘পবিত্র মাতা’র উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

৩. আমার জীবন দর্শন। প্রকাশক : মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা। প্রকাশকাল : ১ ফাল্গুন ১৩৬৭। এ গ্রন্থে গোবিন্দ দেব অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় তাঁর জীবনদর্শন অনেকগুলো অধ্যায়ের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এ অধ্যায়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– মধ্যপথ, আত্মপক্ষ, ইতিহাস দর্শন, বিপর্যস্ত বিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, মানবসমাজ ইত্যাদি। তাঁর জীবনদর্শন সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, ‘আমার দার্শনিক মত জনসমাকীর্ণ রাজপথের ওপরই পড়েছিল। সে অমূল্য রত্ন সেখান থেকেই কুড়িয়ে পেয়েছি। তাকে আমার নিজের বলা চলে না। আমি শুধু আমার ছেঁড়া কাপড়ে তাকে ভালো করে জড়িয়ে জনসাধারণের সামনে হাজির করেছি।’ গ্রন্থটি গোবিন্দ দেবের স্বর্গত পিতা ঈশ্বরচন্দ্র দেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

4. Aspirations of the Common Man. প্রকাশক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩। এ গ্রন্থে গোবিন্দ দেব তাঁর সমন্বয়ী দর্শনের বাস্তব প্রয়োগের কথা বলেছেন যা হচ্ছে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। গ্রন্থটিতে গোবিন্দ দেব আমাদের সমাজজীবনের তথা বিশ্বমানবতার বিভিন্ন সমস্যা ও তার সুষ্ঠু সমাধানের কথা উল্লেখ করে নীতিবোধ ও মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত জীবনদর্শনের কথা

বলেছেন। গ্রন্থটিতে সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদার ভিত্তিতে 'এক বিশ্ব'-এর ধারণার পক্ষ সমর্থন করে তিনি বক্তব্য রেখেছেন।

5. The Philosophy of Vivekananda and the Future of Man. প্রকাশক : রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা। প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ১৯৬৩। গোবিন্দ দেব তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারায় যাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ। গোবিন্দ দেব বিবেকানন্দের বিশ্বজনীনতা, মানবতা এবং সাধারণ মানুষকে ভালোবাসার প্রেরণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এ গ্রন্থে গোবিন্দ দেব বিবেকানন্দের সমন্বয়ী দর্শনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন এবং সেগুলোকে সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য কার্যকরী করে তুলতে চেয়েছেন।

৬. তত্ত্ববিদ্যা-সার। প্রকাশক : কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা। প্রকাশকাল: জুন ১৯৬৬। গ্রন্থটি দর্শনের সমস্যাবলির ওপর রচিত একটি অনন্য পাঠ্যগ্রন্থ। বাজারে প্রাপ্ত দর্শনের সমস্যাবলির গ্রন্থ থেকে এ গ্রন্থটি ভিন্নতর। গ্রন্থটিতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

৭. Buddha, the Humanist. প্রকাশক : প্যারামাউন্ট পাবলিশার্স। প্রকাশকাল : মে ১৯৬৯। গোবিন্দ দেবের সমন্বয়ী দর্শনের মানবতাবাদ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ইত্যাদির অনুপ্রেরণার উৎস ছিল গৌতম বুদ্ধের অনন্য মানবতাবাদ। বুদ্ধকে একজন অতিমানব হিসেবে বিবেচনা না করে গোবিন্দ দেব তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আলোচনা করেছেন। গোবিন্দ দেবের মতে বুদ্ধ একজন মানবতাবাদী এবং মানুষের কল্যাণই ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। তাঁর মতে বুদ্ধের এই মানবতাবাদ ও মানবকল্যাণের বাণী ভবিষ্যৎ মানুষের মধ্যে বিশ্বপ্রেম, বন্ধুত্ব জাগিয়ে তুলতে পারবে এবং মানুষে মানুষে বৈষম্য ভুলতে সাহায্য করবে। গ্রন্থটি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ অধ্যাপক স্ট্যানকো এম ভুজিকার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।

৮. Parables of the East. আমিনুল ইসলাম সম্পাদিত। প্রকাশক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকাশকাল : ১৯৮৪। গ্রন্থটি প্রাচ্যের নীতিবোধক গল্পের সংকলন ও গোবিন্দ দেবের মরণোত্তর প্রকাশনা। প্রাচ্যের তাৎপর্যপূর্ণ, জনপ্রিয় এবং গভীর নীতিবোধসম্পন্ন ছাব্বিশটি গল্পকে গোবিন্দ দেব সহজ-সরল ভাষায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে আমেরিকায় ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে থাকাকালে তিনি এ গল্পগুলো লেখার পরিকল্পনা করেন এবং ১৯৭০ সালের দিকে তিনি ২৭টি গল্প লেখা শেষ করেন বলে জানা যায়। এ গ্রন্থে গোবিন্দ দেবের উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্যের দর্শনানুরাগী পাঠকের নিকট প্রাচ্যের ভাবধারা তুলে ধরা।

৯. My American Experience. আমিনুল ইসলাম সম্পাদিত। প্রকাশক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকাশকাল : ১৯৯৩। এটি দেবের মরণোত্তর প্রকাশনা। দেব ১৯৬৭-৬৮

সালে আমেরিকায় থাকাকালে Nine Months in America : My Humanist Experience Abroad শিরোনামে একটি গ্রন্থ লেখার কাজ এগিয়ে চলেছে বলে জানান। ১৯৬৮-৬৯ সালে দেখা যায় তিনি গ্রন্থটির নামকরণ করেন American Experiences (Nine Months in America) এবং উল্লেখ করেন যে, গ্রন্থটি তেইশ অধ্যায় বিশিষ্ট হবে এবং এর মধ্যে তিনি আটটি অধ্যায় শেষ করেছেন। গ্রন্থটির অবশিষ্ট অধ্যায়গুলো ১৯৬৯-৭০ সালের দিকে শেষ করে তিনি গ্রন্থটির নামকরণ করেন গু অসবৎরপধহ ঊীঢ়বৎরবহপব। বর্তমান প্রকাশিত গ্রন্থে দশটি অধ্যায় রয়েছে, বাকি অধ্যায়গুলো খুঁজে পাওয়া যায়নি। ১৯৭১ সালে দেবের বিশ্ববিদ্যালয়স্থ বাসভবন আক্রমণ ও পরবর্তীকালে নানা কারণে হয়তো বাকি অধ্যায়গুলো হারিয়ে গেছে। এই দশটি অধ্যায় দর্শন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. আবদুল জলিল মিয়ার তত্ত্বাবধানে ছিল বলে জানা যায়।

এ ছাড়াও গোবিন্দ দেব বাংলায় দর্শনের ইতিহাস রচনার কথা বারবার বলতেন, কিন্তু অকালমৃত্যুর ছোবল তাঁকে আর সে কাজ করতে দেয়নি।

গোবিন্দ দেবের মৃত্যু

সাম্প্রতিক কালের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে গোবিন্দ দেবের দার্শনিক অবদান অনন্য। গোবিন্দ দেবের জীবন, জীবনপদ্ধতি ও তাঁর দর্শন নিয়ে তিনি নিজে যেমন কৌতুক ও রসালো গল্প করতেন, তেমনি তাঁর অনুরাগী ভক্তগণও তা তেমনভাবে সাধারণের কাছে পরিবেশন করে আনন্দ উপভোগ করতেন। গোবিন্দ দেব তাঁর নিজের জীবন সম্পর্কে বলেন :

"জীবনের পঞ্চাশের কোঠা বেশ কিছুদিন পেরিয়ে গেছি। যাঁরা আগে থেকে আমাকে জানেন না তাঁদের মধ্যে সহজবুদ্ধি কেউ কেউ আমার বয়স ষাটের কোঠায়ও ফেলতে চান। তাঁরা যে বিশেষ ভুল করেন তা মনে হয় না। অনেকে মায়ের পেট থেকে বেশ কিছু বেশি বয়স নিয়ে জন্মান। চলতি বাংলায় তাঁদের বলা হয় এঁচড়ে পাকা। ছোট বেলায় যতদূর মনে পড়ে আমি সেই সৌভাগ্যবান ক্ষণজন্মা পুরুষদেরই একজন ছিলাম। সেই অকাল-পরিপক্কতার দাগ হয়তো আমার চেহারা থেকে আজও মুছে যায়নি। আমার পাকা চুলের আনাচে-কানাচে অনেকে তার পরশ দেখতে পেয়েই হয়তো আমার বয়সের সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলেন।

ছোটবেলা ঈশ-উপনিষদে পড়েছিলাম ভাল কাজ করে একশ বছর বেঁচে থাকার চেষ্টা করা উচিত। 'কুর্বন্নেবেহ কর্মানি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।' যেদিন এই শ্লোক প্রথম পড়েছিলাম সেদিনের কথা আজও ভুলিনি। এমনি একটা স্থায়ী দাগ তা আমার অন্তরে এঁকে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে নানা সভা-সমিতিতে আবোল-তাবোল বলা আমার এক নেশা হয়ে দাঁড়ায়। কত সভা- সমিতিতে আমার ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ আলোচনা প্রসঙ্গে এই শ্লোকের অবতারণা করেছি তার তালিকা রাখিনি। রাখা সম্ভবও নয়। নিজের নানা দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও ভাল কাজ করে বেঁচে থাকার আগ্রহ আমার ভেতরে খানিকটা সজাগ ছিলো বলেই হয়তো সভ্যলোকদের আসরে এমন কথা বারবার বলার দুঃসাহস করতে পেরেছি। যদিও দর্শনের নানা পুঁথিতে ছোটবেলা থেকে মানুষের বেঁচে থাকার স্বাভাবিক ইচ্ছার কথা পড়েছি, তবু মনে হয় আমার বেঁচে থাকার স্পৃহাটা যেন একটু অস্বাভাবিক– যার জন্য

আমার বয়সের খোঁজই আমি নিতে চাই না । এ জন্যই হয়তো তরুণ সংঘের আজীবন সদস্য পদলাভে আমার এত প্রয়াস । আবার বাল্যাবধি দর্শনের সঙ্গে প্রায় অসহযোগ । কাজেই চুলের রং দেখে বয়স মাপবার সুযোগ থেকেও আমি অনেকটা বঞ্চিত ।

কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণে পড়েছিলাম, রাবণের স্বর্ণ-লঙ্কায় ভস্মলোচন নামে এক রাক্ষস ছিল । বহু তপস্যা করে সে ব্রহ্মার কাছ থেকে বর পেয়েছিল– সে যদি তার নিজের মুখ দেখতে না পায় তবে যুদ্ধে তাকে কেউ মারতে পারবে না । নিজের মুখ নিজের পক্ষে দেখা অসম্ভব ভেবে সে ভেবেছিল সে অমর । কিন্তু এমনি কপালের ভোগ, রাম-রাবণের যুদ্ধে লঙ্কার রণক্ষেত্রে তার মুখের সামনে এক বিরাট দর্পণ হাজির করা মাত্রই নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হল । রাক্ষসরাজ রাবণের শত্রু রামচন্দ্রের এমনি রণকৌশল । ভক্তেরা বলেন লীলা-খেলা । আমি সুদূর অতীতে পূর্বজন্মে ভস্মলোচন ছিলাম কিনা জানি না । জানবার উপায়ও নেই । তবে বর্তমান জীবন দর্শনের প্রতি আমার গভীর অনাসক্তি দেখে ধূম-দর্শনে বহ্নি অনুমানের ন্যায় একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, সে রাক্ষস প্রবরের সঙ্গে আমার হয়তো কিছু আত্মিক সাদৃশ্য আছে ।

আজকালকার কুশলী মনোবিজ্ঞানীদের কাছে হাজির হলে তাঁরা আমার অবচেতন মনে সে রাক্ষসের আঁচড়ও হয়তো দেখতে পারেন । তবে খুব সৌভাগ্যের কথা, স্বপ্নজীবনেও সে রাক্ষসের সঙ্গে, অন্তত তিনি আমাকে চর্বিত রসাস্বাদ করতে উন্মুখ, এমন অভিজ্ঞতা হয়নি । হলে হয়তো মনোবিজ্ঞানীরা বলে বসতেন, জাগ্রত জীবনে বাহিরের পরিবেশের চাপে আমার বিরাট দেহ দ্বারা রাক্ষস প্রবরের তৃপ্তি সাধনে অক্ষম হয়ে স্বপ্নের স্বাতন্ত্র্যলোকে কল্পনায় সে সৌভাগ্য লাভের চেষ্টা করেছি ।

যাই হোক, সোজাসুজি একথা বলাই যথেষ্ট, যদি বা আমার আয়ু একশ'র কোঠায় পৌঁছয় তবুও জীবনে যে এক বড় সতেজ অংশ আমি পেরিয়ে গেছি একথা অস্বীকার করার উপায় নেই । ছোটবেলায় যখন স্কুলে পড়তাম তখন গণিতের শিক্ষক শিখিয়ে দিয়েছিলেন, ভগ্নাংশের মান অর্ধেকের কম হলে তাকে শূন্য বলেই ধরে নিতে হবে । সে হিসেবে আমার আয়ুর ভাণ্ডও আজ শূন্য এবং আমার বেঁচে থাকা না থাকারই শামিল । অতএব যে অশ্বডিম্ব অর্থাৎ দার্শনিক মত আস্বাদন করে আমি এতদিন বেঁচে আছি ও আরও অনেক বছর বেঁচে থাকার দুরাশা পোষণ করি তার সম্বন্ধে এলোমেলোভাবে কিছু বলার এটাই উপযুক্ত কাল ।"

এই দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার, অন্তত একশ বছর বেঁচে থাকার আশা ছিল গোবিন্দ দেবের । তিনি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন, আশাও করেছিলেন যেমন, তেমনি তিনি নিজেও বুঝেছিলেন তা দুরাশা মাত্র । তাঁর সে আশা দুরাশায় পর্যবসিত হয়েছিল এক করুণ ও হৃদয়বিদারক বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে ।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে স্বাধিকার চেতনা জাগ্রত হয়েছিল তারই পথ বেয়ে ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম সূচিত হয় । ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে । কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগণ বঙ্গবন্ধুর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং এক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে । এর পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে দেশে দারুণ

উত্তেজনাকর অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং অসহযোগ আন্দোলন সার্থক রূপ লাভ করে। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগণ ২৫ মার্চের গভীর রাতে আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত সৈন্য দ্বারা নিরস্ত্র নিরপরাধ জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেশের এ বিপদাপন্ন অবস্থা গোবিন্দ দেব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বিকেলে গোবিন্দ দেবের অন্যতম প্রিয়ভাজন ছাত্র ও বিভাগীয় সহকর্মী ড. আবদুল জলিল মিয়ার সঙ্গে রমনা রেসকোর্সের ময়দানে বৈকালিক ভ্রমণকালে গোবিন্দ দেব যে কথাগুলো বলেছিলেন তাতে গোবিন্দ দেবের দেশ সম্পর্কে দূরদৃষ্টির কথাই জানতে পারা যায়। ড. জলিল মিয়ার সঙ্গে গোবিন্দ দেবের সেদিনের বৈকালিক ভ্রমণকালে যে কথাবার্তা হয়েছিল তা এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

"... পঁচিশে মার্চের বিকেল। ঢাকা নগরীর বুকে থমথমে ভাব! অন্যান্য দিনেরমত পাঁচটার দিকে উপস্থিত হলাম ড. দেবের বাড়ী। সেখানে গিয়ে শুনলাম তিনি মাত্র কয়েক মিনিট আগে বের হয়ে গেছেন। সেদিন আমার সংগে ছিলেন সহকর্মী বন্ধু জহুরুল হক সাহেব। দু'জনেই চললাম রেসকোর্সের দিকে, স্যারকে খুঁজতে। ঘোড়-দৌড় মাঠের উত্তর-পশ্চিম দিকটায় যেখানে ড. দেব প্রায়ই ভ্রমণ করতেন, সেদিন গিয়ে দেখি তিনি সেখানে নেই। একটু অবাক হলাম তাঁকে না দেখে! প্রায় আধঘণ্টা আমরা দু'জন তাঁর অপেক্ষায় রইলাম রমনা মাঠের সেই দিকটায় যেখানে অনেক দিন আমি বেড়িয়েছি ড. দেবের সংগে। বেলা ডুবে ডুবে এমন সময় রমনা গ্রীনের উত্তর-পশ্চিম গেট দিয়ে বের হয়ে তিনি এসে ঢুকলেন রমনা মাঠে। ক্লান্ত, অবসন্ন দেখাচ্ছিল সেদিন ড. দেবকে। একটু ভয়ার্তও যেন মনে হয়েছিল সেদিন তাঁকে! তবুও হাসিমুখেই তিনি গ্রহণ করলেন আমার আদাব। তারপর বললেন, 'তেমন ভাল লাগছিল না আজ। তাই একটু আগেই বের হয়ে রমনা গ্রীনের মধ্যে হাঁটছিলাম।' আমি জিজ্ঞেস করলাম– শরীর খারাপ নাকি, স্যার? এতক্ষণে মাঠের খানিকটা ভেতরে ঢুকে পড়েছিলাম আমরা তিনজন। আমার প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে তিনি বললেন, 'এসো, একটু জিরিয়ে নিই।' জিজ্ঞাসুনেত্রে আবার ওঁর দিকে তাকাতেই বললেন, 'একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। মনটাও তেমন ভাল নয়। কোন কাজে মন বসছে না। অথচ কত কাজ পড়ে রয়েছে তা তো তুমি ভাল করেই জান। ফাউন্ডেশনের কাজ, বই লেখার কাজ, সব পড়ে রয়েছে। বাংলা ভাষায় দর্শনের ইতিহাস লেখার পরিকল্পনায় হাত নিতে পারছি না। আবার ফাউন্ডেশনের কাজ বাকি রেখে তাড়াহুড়া করে চলে এলাম আমেরিকা থেকে। কিন্তু দেশের যে অবস্থা তাতে নিরাশ হয়ে পড়েছি। শীঘ্র আর কোন কাজ করতে পারব বলেও মনে হয় না।'

ড. দেবের উপরিউক্ত কথাগুলো অযৌক্তিক ছিল না তবুও ওঁকে সাহস দেবার অভিপ্রায়ে মনে সংশয় থাকা সত্ত্বেও জোরের সংগেই বললাম– এ তো সাময়িক ব্যাপার স্যার, এতে হতাশ হবার তেমন কি আছে? আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন ড. দেব। একটু পরে উঠে পড়লেন তিনি। আমি প্রশ্ন করলাম– দেশের রাজনৈতিক অবস্থা দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে স্যার? জবাবে মনীষী গোবিন্দচন্দ্র দেব 'পেরিপ্যাটেটিক' দর্শনের জনৈক দার্শনিক এরিস্টটলের মতই হাঁটতে হাঁটতে বলতে লাগলেন, 'তোমরা যত সহজ মনে করছ আসলে ব্যাপারটা তত সহজ নয়। আলোচনার ভান করে তলে তলে প্রস্তুতি নিচ্ছে এহিয়া-ভুট্টোচক্র। শেখ মুজিব নতি স্বীকার না করলে শেষবারের মত চরম আঘাত

হানবে এবার তারা বাঙালীদের ওপর। আর তারই সম্ভাবনা বেশী। তোমরা নিশ্চয় স্বীকার করবে, শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলন অভূতপূর্বভাবে সাফল্য লাভ করেছে, এমন কি মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনও এমন পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করতে পারে নাই। আর সে জন্যই দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে বেশী।' ড. দেবের এ উক্তির প্রতিবাদ সেদিন আমরা দু জনার কেউ করিনি। বরঞ্চ আমরাও একমত হয়েছিলাম তাঁর সংগে। কিন্তু তখনও মোটেই ভাবতে পারিনি যে মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই শুরু হবে পঁচিশে মার্চের সেই ভয়াল রাত্রি।

... একটু পরেই এসে পৌঁছলাম শিববাড়ীর কাছে সেই অতি পরিচিত ছোট্ট লাল বাড়ীটায়। তারপর সেই পরিচিত পুরাতন বেতের চেয়ারে বসে চা খেকে খেতে আবার বলতে আরম্ভ করলেন ড. দেব, 'দেশের অবস্থা কখন যে স্বাভাবিক হবে জানি না। অথচ কত কাজ পড়ে রয়েছে। চারখণ্ডে দর্শনের ইতিহাস (গ্রিক দর্শন, মধ্যযুগীয় দর্শন, আধুনিক দর্শন ও সমকালীন দর্শন) লেখার, ফাউন্ডেশনের ঢাকা ব্রাঞ্চ খোলার ও অন্যান্য বই লেখার যে সব পরিকল্পনা রয়েছে তা শেষ করতে কমপক্ষে আরো দশ বছর সময় লাগবে।'...

সেদিন সন্ধায় তাঁর বসবার ঘরে লক্ষ্য করলাম, বেশ খানিকটা অস্থির হয়ে পড়ছিলেন ড. দেব। এক সময় আবেগপূর্ণ কণ্ঠে তিনি বললেন, 'তেমন আপনার বলতে আমার তো কেউ নেই, স্বাস্থ্যও ভেংগে পড়ছে দিন দিন। তাছাড়া দেশের এই অবস্থা দেখে সময় সময় একদম নিরাশ হয়ে পড়ি। মনে হয় বেশী দিন বাঁচবো না এবং আমার এসব কাজও সম্পূর্ণ হবে না।' ... সহাস্য বদনে তিনি আবার করমর্দন করে বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের কথা শুনে মাঝে মাঝে উৎসাহ বোধ করি এবং আমার একশ' বছর বাঁচবার স্পৃহাও প্রবল হয়ে ওঠে। সে যাই হোক, তুমি এখন এসো, রাত হয়েছে। বেশি রাত হলে আবার বৌমা চিন্তা করবে। ইনশাল্লাহ আবার কাল সকালে দেখা হবে।'"

এই ছিল ড. জলিল মিয়ার সঙ্গে গোবিন্দ দেবের শেষ কথা। যা কাল সকালে তাঁদের আর বলা হয়নি। সকাল হবার পূর্বেই বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যরা গুলি করে তাঁর দেহ ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছিল।

গোবিন্দ দেবের মৃত্যুকাহিনীর মর্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক বিবরণ পাওয়া যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিমের একটি প্রবন্ধে। অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিমের প্রবন্ধের কিছু অংশ আমরা এখানে তুলে দিচ্ছি:

: কিন্তু ড. দেবের বাসায় কি ঘটেছিল, তার কিছু কি আপনি জানেন?

: সে ঘটনা সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন ড. দেবের পালিতা কন্যা রোকেয়া বেগম। রোকেয়া বেগম এবং তাঁর স্বামী দু'জনেই ড. দেবের সঙ্গে তাঁর বাসায় থাকতেন। রোকেয়া বেগমের কাছ থেকে আমি শুনেছি সারারাত ধরেই বাড়ির উপর গোলাগুলি বর্ষিত হয়েছে। বাইরে মুখ বাড়াবার উপায় ছিল না। সারারাত ড. দেব অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পদচারণা করেছেন। মাঝে মাঝে তিনি দেহের শক্তি হারিয়ে সম্বিত হারা হয়ে মেঝেতে পড়ে গেছেন। তাঁকে শুশ্রূষা করে আবার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ভোরের দিকে ড. দেব তাঁর মেয়েকে বললেন : মা তুমি একটু চা কর। আমি ততক্ষণে একটু ভগবানের নাম করি। তাঁর মেয়ে হয়তো চা বানিয়ে শেষ করেন নি, এমন সময় দরজায় করাঘাত, বুটের লাথি। খোলার অবসরটুকুও জল্লাদের দল দেয়নি। জোর করে ধাক্কা দিয়ে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকেছে।

: তারপর?

: ঘরে ঢুকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করতে শুরু করেছে বর্বর পশুর দল। 'কাঁহা মালাউন কাঁহা' বলে ড. দেবকে খোঁজ করেছে। মেয়ে রোকেয়া বেগম বাবাকে রক্ষা করার জন্য সামনে এগিয়ে এসেছেন। এগিয়ে এসেছেন তাঁর স্বামী। জল্লাদের মন নরম করার জন্য কলেমা পড়েছেন। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র নরম হয়নি বর্বর পশুর মন। হাত কয়েক ব্যবধান থেকে স্টেনগান দিয়ে গুলি করেছে প্রখ্যাত অধ্যাপক, দার্শনিক ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবকে। ড. দেবের দেহ মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে। পশুর দল গুলি করে হত্যা করেছে রোকেয়া বেগমের স্বামীকেও। রোকেয়া বেগম আকস্মিক আক্রমণ এবং হত্যায় তখন অচেতন হয়ে পড়ে গেছেন। হয়ত সে জন্যই তিনি বেঁচে রয়েছেন।

: তারপর?

: পাক সামরিক বাহিনী এর পরে মৃতদেহ দু'টো রেখে চলে যায়। হয়ত রাস্তার ওপারে কর্মচারীদের দালান আক্রমণ করার জন্য। কিন্তু মিনিট কুড়ি পরে আবার ফিরে আসে এবং ড. দেব এবং রোকেয়া বেগমের স্বামীর লাশ টানতে টানতে নিয়ে যায় জগন্নাথ হলের মাঠের একপাশে যেখানে জড়ো করা হচ্ছিল মৃত অর্ধমৃত অগণিত ছাত্র এবং অন্যান্য লোককে।

এভাবেই ক্ষণজন্মা, খ্যাতিমান ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসম্পন্ন, অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী চিরকুমার দার্শনিক শহিদ হলেন সাম্প্রদায়িকতা ও ষড়যন্ত্রকারী বর্বর পাক সেনাবাহিনীর হাতে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের ভোররাতে।

গোবিন্দ দেবের মৃত্যুর বিবরণ আরো জানা যায় জনৈকা লেখিকার একটি লেখা থেকে। তিনি লিখেছেন, 'এদেশের দর্শন চর্চার প্রাণকেন্দ্র মানবতাবাদী এই ব্যক্তিত্বের জীবনের অবসান ঘটে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের রাতে। পাকিস্তান হানাদারদের হত্যাকাণ্ডের প্রথম শিকার হয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের একজন তিনি। হানাদাররা যখন আক্রমণ করে, তখন তিনি তাদের সামনে দুহাত উর্ধ্বে তুলে মড়ড়ফ ংবহপব–মড়ড়ফ ংবহপব বলে তাদের নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতো সার্বজনীন প্রেমিক মানুষ একথা ভাবতে পারেন নি যে, তাঁর এই মহান আবেদন সম্পূর্ণ অপাত্রে দান। তাদের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র থেকে একাধিক গুলি তাঁর বক্ষভেদ করে দেহকে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত করেছিলো। তিনি ঢলে পড়েছিলেন মৃত্যুর কোলে।' এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ গোবিন্দ দেবের মৃত্যুর সময় তাঁর মা কলিকাতায় বেঁচে ছিলেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

গোবিন্দ দেবের দর্শনের পটভূমি

কোনো কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-দার্শনিক তাঁর যুগের উর্ধ্বে নন, অর্থাৎ, তাঁরা তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উর্ধ্বে নন। তাই লক্ষ করা যাবে যে, তাঁদের চিন্তাধারায় সে যুগের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। কথাটি যেমন প্লেটো, এরিস্টটল, কান্ট, হেগেল, মার্কস প্রমুখের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি তা গোবিন্দ দেবের দর্শনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই আমরা দেখি প্লেটো, এরিস্টটল যেমন তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে দাসযুগকে সমর্থন না করে পারেননি, কান্ট, হেগেলও তেমনি তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণেই

ভাববাদকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছেন। এ জন্যই দর্শন হচ্ছে জীবনদর্শন। দর্শনে প্রতিফলিত হয় যুগ-চেতনা।

ব্রিটিশ উপনিবেশ শাসন-শোষণের জাঁতাকল থেকে মুক্তিকামী এ উপমহাদেশের মানুষ যখন সংগ্রামে অবতীর্ণ, এবং যার প্রেক্ষিতে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সূচনা তার দু বছর পর গোবিন্দ দেব জন্মগ্রহণ করেন। একদিকে পারিবারিক অসচ্ছলতা, অভাব, অনটন অন্যদিকে মুক্তিকামী জনগণের শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষার চেতনার ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠেন গোবিন্দ দেব। একদিকে কংগ্রেসের উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ, অন্যদিকে মুসলিম লীগের উগ্র সাম্প্রদায়িকতা– এগুলো স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হয়েও। এ দুটি পরস্পরবিরোধী দ্বন্দ্ব অন্যদিকে চিরায়ত হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যে লালিত গোবিন্দ দেব যে 'এক বিশ্ব' 'বিশ্বভ্রাতৃত্ব' তথা সমন্বয়ী দর্শনের কথা বলবেন এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক।

হিন্দুধর্মের চিরায়ত ঐতিহ্যে লালিত গোবিন্দ দেব তাঁর দর্শনের পটভূমি হিসেবে ইসলাম, খ্রিস্ট ও বৌদ্ধ ধর্মসহ অন্যান্য ধর্মের প্রতি সম-গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি একদিকে যেমন বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, প্রভাবিত হয়েছেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের সমন্বয়ী ভাব দ্বারা, স্বামী বিবেকানন্দের আধুনিক হিন্দু ভাব দ্বারা, তেমনি সমভাবে প্রভাবিত হয়েছেন তথাগত ভগবান বুদ্ধের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা, ইসলামের সাম্য ও মৈত্রীর বাণী দ্বারা, খ্রিস্টধর্মের প্রেমের অমৃত বাণী দ্বারা। তাঁর দর্শনের প্রেরণা তিনি পেয়েছেন দেশ-কাল-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে, নানা স্থান থেকে। পাশ্চাত্য দর্শন, ভারতীয় দর্শন, মুসলিম দর্শন সবই ছিল তাঁর প্রেরণার উৎস। তাঁর দর্শনে তাই হিন্দু, খ্রিস্ট, ইসলাম, বৌদ্ধধর্ম কিছুই বাদ পড়েনি। পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এই মধ্যপথের বাণী ঘোষিত হয়েছে ইসলামের ভিতর। দীন দুনিয়া, ধর্ম আচরণ ও সংসার জীবন, এ দু'য়ের সামঞ্জস্য বিধান কোরানের বিশেষ নির্দেশ।' ইসলাম ধর্ম প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন : 'Islam as a world-religion stands for a great synthesis. It is another name for the middle path between shunning the world straightaway and losing one's self in it. The life of the great Prophet, Muhammad, exhibits this compromise in a very remarkable way.' বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বুদ্ধ যুগ যুগ ধরে মধ্যপথের বাণী প্রচার করেছেন এবং তাঁর কণ্ঠ থেকে উদাত্ত কণ্ঠে মৈত্রীর বাণী উচ্চারিত হয়েছে। বুদ্ধকে তিনি আকাশের মতো উদার ও সমুদ্রের মতো গভীর হৃদয়ের অধিকারী বলে উল্লেখ করেন। বিভিন্ন দর্শনের এই সমন্বয়সাধনই গোবিন্দ দেবের দর্শনের পটভূমি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে বিশেষজ্ঞ গোবিন্দ দেব লক্ষ করেছেন যে, একদিকে প্লেটো থেকে শুরু করে চিরায়ত ভাববাদের প্রভাব ও বিকাশ অন্যদিকে মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষায় সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য অর্থনৈতিক মুক্তির দর্শন তথা বস্তুবাদী দর্শন। প্লেটোর মতে ভাববাদ মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র সহায়ক শক্তি। কিন্তু গোবিন্দ দেবের মতে প্লেটোর এই দৃষ্টিভঙ্গি একদেশ-দর্শী। কারণ এতে সাধারণ মানুষের পার্থিব মুক্তির জন্য কোনো ভূমিকা নেই। আর শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে পরব্রহ্মে বিলীন হওয়াটা মানুষের

জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। অন্যদিকে গোবিন্দ দেবের মতে মার্কসীয় দর্শন তথা বস্তুবাদী দর্শনে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি হতে পারে কিন্তু মানুষের আধ্যাত্মিক মুক্তি হতে পারে না। তাই গোবিন্দ দেব যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, মানুষ বস্তু ও ভাব উভয়েরই সমষ্টি। একটি অপরটির সম্পূরক। তিনি বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একটি সমন্বয়ী দর্শন আমাদের উপহার দিয়েছিলেন। মার্কসবাদে বিশ্বাসী না হয়েও তিনি মার্কসের মতোই সাধারণ মানুষের মুক্তির কথা বলেছেন, সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছেন। গোবিন্দ দেবের ভাষায় :'জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদকে আমি পরস্পরবিরোধী মনে করি না। আজকের দিনের বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিবেশে সহাবস্থিতির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। আমি সেই সহাবস্থিতির ফর্মুলাই জীবন দর্শনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চাই।' গোবিন্দ দেবের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এ সমন্বয়ী দর্শন আজকের ইউরোপীয় পরিবর্তনের সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে অনেকেই মনে করেন।

বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাসকে নিয়ে নজরুলের কবিতা

....

এ ম এ আ জি জ মি য়া

পূর্ণচন্দ্র দাস: পূর্ণ-অভিনন্দন

[ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন মাদারীপুরের পূর্ণচন্দ্র দাস (১৮৮৯–১৯৫৬)। ১৮৮৯ সালের ২৬ জুন তিনি মাদারীপুরের সমাজ-শিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বিপ্লবী দলটির নাম ছিল পূর্ণ দাসের দল বা মাদারীপুরের বিপ্লবী দল। ১৯১০ সালে তিনি মাদারীপুর হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে পড়াকালে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন এবং মাদারীপুরে তিনি বিপ্লবী দল গঠন করেন। ১৯১৩ সালে তিনি ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলা'য় গ্রেপ্তার হন। সাক্ষী-প্রমাণের অভাবে তিনি মামলা থেকে অব্যাহতি পান। ১৯১৪-১৫ সালে তিনি প্রখ্যাত বিপ্লবী বাঘা যতীনের (১৮৮৯–১৯১৫) সঙ্গে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হন। ১৯১৫ সালে বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বালেশ্বরের ট্রেনযুদ্ধে তাঁর যে চারজন সহযোগী ছিল তাঁরা সকলেই ছিলেন পূর্ণ দাসের দলের। ১৯১৪–১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতরক্ষা আইনে জেলে আটক ছিলেন। ১৯২১ সালে জেল থেকে বেরিয়ে এসে মাদারীপুরে শান্তিসেনা গঠন করেন। ১৯২২ সালে তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন। ১৯২৩ সালে তিনি বহরমপুর জেলে থাকা কালে বিদ্রোহী কবি

কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে (১৮৯৯–১৯৭৬) ঘনিষ্ঠ হন। পূর্ণ দাস জেল থেকে মুক্তি লাভ করলে 'পূর্ণ অভিনন্দন' নামে একটি গান রচনা করে পাঠান। ১৯৩৬ সালে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থটি পূর্ণ দাসকে উৎসর্গ করেন। পরবর্তীকালে পূর্ণ দাস নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর (১৮৯৭–১৯৪৫) ফরওয়ার্ড ক্লাবে যোগদান করেন। ১৯৪০–১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি জেলে অন্তরীণ ছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তিনি বিপ্লবী রাজনীতি পরিত্যাগ করে সমাজকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫৬ সালের ৪ মে বালিগঞ্জে সুবোধ নামক জনৈক আততায়ীর ছুরিকাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন।

বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাস, কাজী নজরুল ইসলাম, আফতাবুল ইসলাম ও অন্যান্যদের বহরমপুর জেলজীবনের কথা এবং পূর্ণচন্দ্র দাসের কারামুক্তি উপলক্ষে কাজী নজরুল ইসলাম 'পূর্ণ-অভিনন্দন' গানটির রচনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে 'স্বাধীনতা যুদ্ধে মাদারীপুর' গ্রন্থের লেখক বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী কালীপদ রায় চৌধুরী (১৮৯৮–১৯৭৭) লিখেছেন :

"[...] টেনু, অমলেন্দু আগেই জামিনে খালাশ হয়েছিল। আমাকে একা ংবমৎবমধঃরড়হ ড়িংফ-এ দিন কাটাতে হচ্ছে। পড়াশুনা, খেলাধুলার কোন সুযোগই দেওয়া হয়নি, অবসাদগ্রস্ত মন নিয়ে নিঃসঙ্গ দিনগুলো কাটাতে হচ্ছে। বিশেষ কী একটা পর্ব উপলক্ষে পূর্ণদা, কাজী সাহেব প্রভৃতির চেষ্টায় একদিনের জন্য আমি তাঁদের সঙ্গে থাকার অনুমতি পেলাম। বিদ্রোহী কবি সারাটা দিন তাঁর গান, আবৃত্তি এবং অট্টহাসিতে মাতিয়ে রাখলেন। কবির অট্টহাস্যে মনে হত ঘরের দেয়াল ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, ছাদ ভেঙ্গে মাথায় পড়বে। পূর্ণদার শীঘ্রই জেল থেকে মুক্তিপাওয়ার কথা। তিনি মুক্তি পেয়ে মাদারীপুর পৌঁছলে জনগণের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনার আয়োজন আগে থেকেই চলছিল। এই উপলক্ষে বিদ্রোহী কবিকে একটি কবিতা লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি আনন্দের সঙ্গেই সম্মতি দিলেন।" **(স্বাধীনতা যুদ্ধে মাদারীপুর, পৃ. ৮৩)** তারপর কিভাবে তিনি সেটা হাতে পেলেন, এবং সংরক্ষণ করলেন সে সম্পর্কে লিখেছেন: "একদিন সকালে যথারীতি ফালতুর হাতে জলখাবারের চা-পাঁউরুটি এল। খেতে বসেছি, হঠাৎ পাঁউরুটির ভেতর থেকে ভাঁজ করা ছোটো এক টুকরো কাগজ বেরিয়ে পড়ল। কৌতূহলী হয়ে ভাঁজ খুলে দেখি বিদ্রোহী কবির লেখা পূর্ণদাকে অভিনন্দনজ্ঞাপক একটি কবিতা। কবি আমার অনুরোধ রেখেছেন। মন আনন্দে ভরে উঠল। জেল থেকে বেরোবার সময় পাছে জেল কর্তৃপক্ষ গেটে তল্লাশি করে সেটা রেখে দেয়, সেই ভয়ে বারবার পড়ে কবিতাটি মুখস্ত করে ফেললাম। ঠিক মনে আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য বারবার তা মনে মনে আবৃত্তি করি। অবশেষে কবিতাটি বারবার স্মরণ করতে-করতেই একদিন জেল থেকে বার হলাম। পাছে ভুলে যাই, এজন্য ছাড়া পাওয়া মাত্র প্রথমেই সোজা বহরমপুর কংগ্রেস অফিসে গিয়ে কাগজ-কলম চেয়ে নিয়ে কবিতাটি লিখে ফেললাম। সতর্কতা হিসাবে ওই দিনই ডাকে এক কপি মাদারীপুরে পাঠালাম, আর এক কপি আমি সঙ্গে নিয়ে মাদারীপুর রওয়ানা হলাম। পরে পূর্ণদা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সেখানে গেলে অভ্যর্থনা সভায় কাজী নজরুলের "এসো অষ্টমী পূর্ণচন্দ্র, এসো পূর্ণিমা-পূর্ণচাঁদ..." ইত্যাদি যে অভিনন্দন কবিতাটি পাঠ করা হয়, এটিই সেই কবিতা।]

পূর্ণ-অভিনন্দন [কবিতা/গান]

কা জী ন জ রু ল ই স লা ম

এস অষ্টমী–পূর্ণচন্দ্রঃ এস পূর্ণিমা– পূর্ণচাঁদ!
ভেদ করি পুনঃ বন্ধ কারার অন্ধকারের পাষাণ-ফাঁদ!
এস অনাগত নব-প্রলয়ের মহা সেনাপতি মহামহিম!
এস অক্ষত মোহান্ধ-ধৃতরাষ্ট্র-মুক্ত লৌহ-ভীম!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

ছয়বার জয় করি কারা-ব্যূহ, রাজ-রাহু-গ্রাস-মুক্ত চাঁদ!
আসিলে চরণে দুলায়ে সাগর নয়-বছরের মুক্ত-বাঁধ ।
নবগ্রহ ছিঁড়ি ফণী-মনসার মুকুটে তোমার গাঁথিলে হার,
উদিলে দশম মহাজ্যোতিষ্ক ভেদিয়া গভীর অন্ধকার!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

স্বাগত শুদ্ধ রুদ্ধ-প্রতাপ, প্রবুদ্ধ নব মহাবলী!
দনুজ-দমন দধীচি-অস্থি, বহ্নিগর্ভ দম্ভোলী!
স্বাগত সিংহ-বাহিনী-কুমার! স্বাগত হে দেব-সেনাপতি!
অনাগত রণ-কুরুক্ষেত্রে সারথি-পার্থ-মহারথী!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

নৃশংস রাজ-কংস-বংশে হানিতে তোমরা ধ্বংস-মার!
এস অষ্টমী-পূর্ণচন্দ্র, ভাঙিয়া পাষাণ-দৈত্যাগার!
এস অশান্তি-অগ্নিকাণ্ডে শান্তিসেনার কাণ্ডারি!
নারায়ণী-সেনা-সেনাধিপ, এস প্রতাপের হারা-তরবারী!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

ওগো অতীতের আজো-ধূমায়িত আগ্নেয়গিরি ধূম্রশিখ!
না-আসা-দিনের অতিথি তরুণ তব পানে চেয়ে নির্নিমিখ!

জয় বাঙলার পূর্ণচন্দ্র, জয় জয় আদি-অন্তরীণ,
জয় যুগে-যুগে-আসা-সেনাপতি, জয় প্রাণ আদি-অন্তহীন!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

স্বর্গ হইতে জননী তোমার পেতেছেন নামি মাটিতে কোল,
শ্যামল শস্যে হরিৎ ধান্যে বিছানো তাঁহারই শ্যাম আঁচল।
তাঁহারি স্নেহের করুণ গন্ধ নবান্নে ভরি উঠিছে ঐ,
নদীস্রোত-স্বরে কাঁদিছেন মাতা, "কই রে আমার দুলাল কই?"
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

মোছ আঁখি-জল, এস বীর! আজ খুঁজে নিতে হবে আপন মায়,
হারানো মায়ের স্মৃতি-ছাই আছে এই মাটিতেই মিশিয়া, হায়!
তেত্রিশ কোটি ছেলের রক্তে মিশেছে মায়ের ভস্ম-শেষ,
ইহাদেরই মাঝে কাঁদিছেন মাতা, তাই আমাদের মা স্বদেশ!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

এস বীর! এস যুগ-সেনাপতি! সেনাদল তব চায় হুকুম,
হাঁকিছে প্রলয়, কাঁপিছে ধরণী, উদ্‌গারে গিরি অগ্নি-ধূম।
পরাধীন এই তেত্রিশ কোটি বন্দীর আঁখি-জলে হে বীর,
বন্দিনী মাতা যাচিছে শক্তি তোমার অভয় তরবারির।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

গল-শৃঙ্খল টুটেনি আজিও, করিতে পারি না প্রণাম পা'য়,
রুদ্ধ কণ্ঠে ফরিয়াদ শুধু গুমরিয়া মরে গুরু ব্যথায়।
জননীর যবে মিলিবে আদেশ, মুক্ত সেনানী দিবে হুকুম,
শত্রু-খড়্গ-ছিন্ন-মুণ্ড দানিবে ও-পায়ে প্রণাম-চুম।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

সা ক্ষা ৎ কা র

বিশ্বে পাট নিয়ে বিশাল সম্ভাবনার নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশ

....

মা ক সু দু ল আ ল ম

[মাকসুদুল আলমের জন্ম ফরিদপুরে। জন্মতারিখ ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৪। বিডিআরে বাবার চাকরি সূত্রে ঢাকা পিলখানাতেই কেটেছে শৈশব-কৈশোর। ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে মাকসুদুল উচ্চশিক্ষা নিতে চলে যান তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের (বর্তমান রাশিয়া) মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে। সেখান থেকে অণুজীববিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি শেষ করেন। মাকসুদুল তাঁর দ্বিতীয় পিএইচডি করেন জার্মানির ম্যাক্স প্লানক ইনস্টিটিউট থেকে। এরপর শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীববিজ্ঞান বিভাগে। ১৯৯৭ সালে পান এনআইএইচ শ্যানান অ্যাওয়ার্ড। অণুজীববিজ্ঞানে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে দেওয়া হয় এই পুরস্কার। ২০০১ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বোর্ড অব রিজেন্টস এক্সেলেন্স অব রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড পান তিনি। একসময়ে পিলখানার খেলার মাঠে বিকেলবেলা সব ছেলেপেলের দল হৈহুল্লোড় করে খেলাধুলা করত। মাকসুদুল সবার সঙ্গে যোগ দিলেও মাঝেমধ্যে উধাও হয়ে যেত কোথায় যেন। অনেক খুঁজে তাকে শেষে পাওয়া যেত কোনো গাছগাছালি অথবা লতাপাতার সামনে। লতাগুল্ম নেড়ে নিবিষ্ট মনে কী যেন দেখছে মাকসুদুল। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটত। এভাবেই কাটছিল ছোটবেলা। মাকসুদুল আলম গবেষণা করেছেন, রাশিয়া, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র হয়ে মালয়েশিয়ার বড় বড় গবেষণাকেন্দ্রে। পেঁপে, রাবার ও সর্বশেষে পাটের মতো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ফসলের জীবনরহস্য উন্মোচন করে পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন এই গবেষক। যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী জার্নাল *ন্যাচার* মাকসুদুল আলমকে নিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, তাঁকে 'বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবক' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

২০১৩-র ১৬ জুন মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে পাটের জিন-নকশা উন্মোচনের সংবাদ শুধু বাংলাদেশের নয়, সারা পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ সংবাদমাধ্যম ফলাও করে প্রচার করে। পাট নিয়ে একই ধরনের গবেষণা করছে এমন প্রতিযোগী দেশগুলোর গণমাধ্যমে সংবাদটিকে ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে মাকসুদুল আলম ও তাঁর দলের এ সাফল্য দিয়েছে বাংলাদেশের সোনালি আঁশের সোনালি দিন ফিরিয়ে আনার সুখবর। সোনালী দিনের স্বপ্নপুরুষ মাকসুদুল আলম ২১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে ৬০ বছর বয়সে

মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখ্য, সাক্ষাৎকারটির কিছু অংশ গৃহীত হয় জুন ২০১০-এর কোন এক তারিখে এবং কিছু অংশ গৃহীত হয় জুন ২০১৩-এর কোন এক তারিখে।]

ইফতেখার মাহমুদ

প্রাণরসায়ন নিয়ে গবেষণায় আপনার হাতেখড়ি কখন থেকে এবং কীভাবে?

মাকসুদুল আলম

আমি তখন ঢাকার গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়ি। বাবা বুড়িগঙ্গার পারে কামরাঙ্গীরচরে একখণ্ড জমি কিনলেন। সেখানে একটি ঘরও তৈরি করলেন। আমি প্রায়ই সেখানে যেতাম। নিজের উদ্যোগেই ঘরের এক কোণে একটি গবেষণাগার তৈরি করলাম। বিভিন্ন উদ্ভিদের লতাপাতা এনে একটার সঙ্গে আরেকটা মিলিয়ে দেখতাম, কী হয়। প্রাণরসায়ন নিয়ে গবেষণায় হাতেখড়ি আমার সেখান থেকেই।

ইফতেখার মাহমুদ

জিন নকশা উন্মোচনের যে অব্যাহত গবেষণা, এর শুরুর দিকটা সম্পর্কে যদি বলেন...

মাকসুদুল আলম

একবার দেশে প্রচণ্ড বন্যা হল। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর বাবা আমাদের জমিতে ঢ্যাঁড়সের বীজ লাগালেন। কয়েক মাস পর দেখলাম, সেখানে বিশাল আকৃতির ঢ্যাঁড়স হয়েছে। এত বড় ঢ্যাঁড়স আগে কখনো দেখিনি। অবাক হয়ে ভাবলাম, বন্যার আগেও তো বাবা ঢ্যাঁড়সের চারা রোপণ করেছিলেন। কিন্তু এবার এত বড় আকৃতির ঢ্যাঁড়স কীভাবে হল? এই গভীর রহস্যময় আচরণ আমাকে ভাবিয়ে তুলল। ভাবলাম, নিশ্চয়ই এখানে মাটি, পানি ও বীজের মধ্যে এমন কোনো সমন্বয়ের ব্যাপার আছে, যা ফসলের চেহারা ও আকৃতি একেক সময়ে একেক রকম করে দেয়। কী করলে সারা বছর ও সব জায়গায় একই রকমের উন্নত ফসল পাওয়া সম্ভব, তা অনুসন্ধান করতে থাকলাম। এভাবেই রহস্য উন্মোচনের পথে আমার যাত্রা শুরু।

ইফতেখার মাহমুদ

দেশি বা তোষা পাটের জীবনরহস্য উন্মোচনের বিষয়টি সম্পর্কে কিছু বলুন।

মাকসুদুল আলম

একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভিশন-মিশন নিয়ে আমরা তোষা পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন করেছিলাম। কারণ, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চাষ হওয়া পাটের সিংহভাগই তোষা পাট।

ইফতেখার মাহমুদ

কত দিনের মধ্যে আপনারা কৃষকের হাতে পাটের নতুন জাত পৌঁছে দিতে পারবেন?

মাকসুদুল আলম

এ ধরনের গবেষণার ফলাফল পাওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে সময়সীমা বেঁধে কাজ করা কঠিন। তবে এখন পর্যন্ত যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তাতে আশা করা যায়, আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে আমরা নতুন ওই জাত পরীক্ষামূলকভাবে চাষ শুরু করতে পারব। সবকিছু ঠিকঠাকমতো চললে কৃষকের হাতে নতুন জাত পৌঁছে দিতে সর্বোচ্চ চার-পাঁচ বছর লাগতে পারে।

ইফতেখার মাহমুদ

কিন্তু পাটের তো এখন দুর্দিন যাচ্ছে। কৃষক এখনই যা উৎপাদন করছেন, তার ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না; নতুন জাত চাষের ক্ষেত্রে তারা কি আগ্রহ পাবেন বলে মনে করেন?

মাকসুদুল আলম

আমাদের কাজ কৃষকের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে নতুন জাত উদ্ভাবন করা। আমরা দেখেছি, ছত্রাক ও পোকার আক্রমণে কৃষকের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পানির কারণে কৃষক পাট পচাতে পারেন না। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অতিরিক্ত লবণাক্ততার কারণে পাটের চাষ করা যায় না। আমরা এই সমস্যাগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী জাত উদ্ভাবনের চেষ্টা করছি। একই সঙ্গে আমাদের লক্ষ্য থাকবে পাটের জাতের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্যগুলো যুক্ত করা, যার চাহিদা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে রয়েছে। যেমন: দেশের বস্ত্রশিল্পে কাপড় তৈরির উপযোগী সুতা পাট থেকে উৎপাদন করা যাচ্ছে না। আমরা চেষ্টা করছি, পাটের আঁশকে আরও সূক্ষ্ম ও শক্ত করা যায় কি না, যা থেকে উন্নতমানের সুতা উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

ইফতেখার মাহমুদ

কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে কি পাটের সেই চাহিদা আছে? চাহিদা তো দিন দিন কমছে...

মাকসুদুল আলম

চাহিদা কমার বড় কারণ, পাটের ব্যবহার শুধু বস্তা, রশি ও অন্যান্য শৌখিন দ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু একটি পরিবেশসম্মত কৃষিপণ্য হিসেবে বিশ্বে পাটের বিশাল সম্ভাবনা আছে। বাংলাদেশ সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার নেতৃত্ব দিতে পারে। তবে এ জন্য আমাদের শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদেরও প্রস্তুতি নিতে হবে।

ইফতেখার মাহমুদ

কীভাবে সেই প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব? তা কি নেওয়া হচ্ছে?

মাকসুদুল আলম

পাটের জীবনরহস্য উন্মোচনের পূর্বপ্রস্তুতি আমাদের ছিল না– এমন প্রশ্ন পাঁচ-ছয় বছর আগে কেউ যদি করত, তাহলে উত্তর নিশ্চয়ই হত 'না'। কিন্তু আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা এই কয়েক বছরের মধ্যেই তোষা পাট ও ছত্রাকের জীবনরহস্য উন্মোচন করে দেখিয়ে দিয়েছেন, তা সম্ভব। আমরা এখন একের পর এক স্বত্ব (পেটেন্ট) পাওয়ার জন্য আবেদন করছি।

শুরুতে আমরা ভাবতাম যে আমাদের তো কৃতিস্বত্বের আবেদন করার মতো বিশেষজ্ঞ আইনজীবী নেই। আমরা তিনজন তরুণ আইনজীবীকে এ কাজের আইনি পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দিলাম। তাঁরা এখন উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মোট পাঁচটি কৃতিস্বত্বের আবেদন করেছেন। আরও ১১টির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ফলে আমরা দেখছি, চেষ্টা ও দেশপ্রেম নিয়ে কাজ করলে সব সম্ভব। জিনোম গবেষণার ফলাফলকে দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগানোর জন্য প্রস্তুতি আমাদের কৃষক, শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারির ভিত্তিতে কাজ করলে দ্রুত সফলতা পাওয়া সম্ভব।

ইফতেখার মাহমুদ

জৈবপ্রযুক্তি ও জিনোম গবেষণার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার কত বড়? স্বত্ব পেলে আমাদের পক্ষে ওই বাজারে কতটুকু কীভাবে যুক্ত হওয়া সম্ভব?

মাকসুদুল আলম

বৃহত্তর পরিসরে যদি বলি, তাহলে কমপক্ষে এক ট্রিলিয়ন (এক লাখ কোটি) ডলারের বাজার এটি। জিনোম গবেষণার ফলাফলগুলোকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়ে যেতে পারলে সেটা আরও কয়েক গুণ বাড়বে। নতুন ধরনের এনজাইম তৈরি হচ্ছে।

আমরা যে এনজাইমটির জীবনপ্রক্রিয়া জানতে পেরেছি, তা বিশ্বের এনজাইম বাজারের চাহিদার ২০ শতাংশ মেটায়। স্বত্ব পেলে কয়েক হাজার কোটি টাকার ওই বাজারে বাংলাদেশ অংশ নিতে পারবে। ছত্রাকের ওপরে যে কৃতিস্বত্বগুলোর জন্য আমরা আবেদন করেছি ও আবেদনের প্রস্তুতি নিচ্ছি, তা পেলে আমাদের অর্থনীতির চেহারাই বদলে যাবে। কেননা, ওই বিষয় নিয়ে বিশ্বের যেখানেই যাঁরা গবেষণা করবেন, তাঁদের বাংলাদেশকে স্বত্ব বাবদ অর্থ দিতে হবে। ফলে এই গবেষণাগুলোর বহুমুখী অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে।

ইফতেখার মাহমুদ

কিন্তু জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্যপণ্য নিয়ে বিশ্বজুড়ে তো অনেক বিতর্ক রয়েছে। এর পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যগত প্রভাব নিয়ে অনেক ধরনের সমালোচনা আছে। জিনোম গবেষণা এ থেকে কতটুকু মুক্ত?

মাকসুদুল আলম

মনসান্টোসহ বিশ্বের অনেক বড় বড় কোম্পানির উৎপাদিত পণ্য নিয়ে বিশ্বের অনেক দেশেই আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। জিনোম গবেষণার মাধ্যমে যে ফসল ও পণ্য তৈরি হবে, তাতে আমরা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছি। অর্থাৎ, আমরা জাত উদ্ভাবনের সময় প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রাখি, যাতে ওই জাতটি বেড়ে উঠতে পারে।

ইফতেখার মাহমুদ

আপনারা একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ওই গবেষণাগুলো করছেন। তারও একটি মেয়াদ আছে। এই গবেষণা ও উদ্যোগগুলোকে টেকসই করতে কী প্রয়োজন?

মাকসুদুল আলম

আমি মনে করি, আমাদের এই জৈবপ্রযুক্তি গবেষণা কেন্দ্রটি একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। লক্ষ্য পূরণের জন্য একে একটি জাতীয় জিনোম গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমি নিজে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের একটি গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছি। এই কেন্দ্রটি স্থাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে অর্থ দেওয়া হয়েছিল, তা আমরা কয়েক বছরের মধ্যেই ফেরত দিয়েছি। আট বছর ধরে ওই কেন্দ্র নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। নিত্যনতুন গবেষণা করছে, গবেষক তৈরি করছে।

বাংলাদেশেও এটি সম্ভব। সরকার আমাদের প্রকল্প বাবদ যে অর্থ দিয়েছে, আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে নিজেরা উপার্জন করে ফেরত দিতে পারব। আমাদের এই কেন্দ্রের গবেষণার ফলাফল ও দক্ষতাকে কাজে লাগানোর জন্য অনেক ধরনের প্রস্তাব ইতোমধ্যে আমাদের কাছে আসতে শুরু করেছে। ফলে আমরা আত্মবিশ্বাসী এই গবেষণা কেন্দ্রটি আগামী দিনের বাংলাদেশের বিজ্ঞান গবেষণার নতুন পথের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। সে ধরনের বিজ্ঞানী আমরা ইতোমধ্যে এখানে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি।

ইফতেখার মাহমুদ

এর জন্য কী প্রয়োজন?

মাকসুদুল আলম

আমাদের এই গবেষণা কেন্দ্রটি নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। কোনো একটি ফলাফল পাওয়ার চূড়ান্ত মুহূর্ত এলেই আমরা জাতির সামনে তা তুলে ধরছি। আমাদের এই গবেষণার ফলাফল দেশের সব মানুষের। দেশের সর্বস্তরের সব মানুষ আমাদের যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দিয়েছে, আমরা তা জাতিকে গবেষণার ফলাফলের মাধ্যমে ফেরত দিতে চাই।

ইফতেখার মাহমুদ

১৯৭১-এর মুক্তি-সংগ্রামে আপনার বাবাকে পাঞ্জাবি বাহিনী ধরে নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দেয়নি। এ বিষয়ে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই...

মাকসুদুল আলম

১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম সপ্তাহেই পাকিস্তানি বাহিনী আমার বাবা দলিলউদ্দিন আহমেদকে ধরে নিয়ে যায়। সে বছরের ৩ এপ্রিল পিলখানার এক কোনায় বিডিআরের বেশ কয়েকজন সদস্যকে পাকিস্তানি বাহিনী গুলি করে হত্যা করে। সেখানে আমার বাবাও ছিলেন।

ইফতেখার মাহমুদ

অল্প বয়সে বাবাকে হারালেন। এরপর মা-ই তো আপনার একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। আপনার এই ধরনের জীবন তৈরিতে মায়ের অবদান সম্পর্কে কিছু বলুন...

মাকসুদুল আলম

কাপড় সেলাই করাকে পেশা হিসেবে নিয়ে মা লিরিয়ান আহমেদ সংসারের খরচ চালাতেন। বড় ভাই মনজুরুলসহ চার ভাই ও চার বোনের সবাই টিউশনি করে নিজেদের পড়াশোনার খরচ জোগাড় করতেন। মায়ের নিরলস সংগ্রাম আর সাধনার গুণেই সংসারে সুদিন এল একদিন। সবার বড় বোন শামসুন নাহার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর শেষ করে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিতে যোগ দিলেন। তিনি অন্য ভাই-বোনদের উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব নিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, নিজের গায়ের চামড়া দিয়ে জুতা বানিয়ে দিলেও আমার বড় বোনের ঋণ শোধ হবে না। তিনি আমার জন্য যা করেছেন, তা না পেলে আমার পক্ষে এতদূর আসা সম্ভব হত না। (বলতে না বলতেই তাঁর চোখ জলে ছলছল করে ওঠে।) (মায়ের কথা বলতে গিয়ে আবেগ আর চোখের জলে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে আবারও। 'সব ভাই-বোনকে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত করে বিয়ে দিয়ে মা মারা গেলেন ১৯৯৮ সালে। ঠিক বাবার মৃত্যুর দিনেই, অর্থাৎ ৩ জুন।' কিছুক্ষণ থামলেন মাকসুদুল। তারপর বললেন) একজন সচেতন মা একটি শিক্ষিত জাতি তৈরি করতে পারে। আমার মা পড়াশুনা কম জানলেও তিনি শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বাংলাদেশকে বিজ্ঞানে এগিয়ে নিতে হলে নারীদের বিজ্ঞানমুখী করতে হবে। তারাই মা হয়ে তার সব সন্তানকে বিজ্ঞানমনস্ক করতে পারবে। সেটা করা গেলে এর প্রভাব হবে বহুমুখী।

ইফতেখার মাহমুদ

সোনালি আঁশ পাটের জিন-নকশা আবিষ্কারের গল্পটা নিশ্চয়ই অনেক দীর্ঘ। সংক্ষেপে যদি সেই গল্পের কিছুটা বলেন...

মাকসুদুল আলম

যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পেঁপের জীবনরহস্য উন্মোচনের (জেনোম সিকোয়েন্সিং) সময় আমার শুধু আফসোস হয়েছে দেশের জন্য কিছু করতে পারলাম না বলে। সুযোগ পেলে আমাদের দেশের জন্য প্রয়োজনীয় শস্য ও ফসলের জিন-নকশা উন্মোচন করার সাধ তখন থেকেই ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই রাজ্যের প্রধান ফসল পেঁপে। জিন-নকশা উন্মোচনের পর তাঁরা বেশ কিছু নতুন জাত উদ্ভাবন করলেন। পেঁপের বেশ কিছু রোগ হত। পোকার আক্রমণে প্রচুর পেঁপে নষ্ট হত। কৃষক বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হত। উন্নত জাত উদ্ভাবন করে কৃষকের হাতে পৌঁছে দেওয়ার পর তাদের ভাগ্য বদলে গেল। পেঁপের উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে গেল। হাওয়াই রাজ্যের কৃষি-অর্থনীতির চেহারাই পাল্টে গেল। মনে হচ্ছিল, নিজের দেশের ধান, পাট, বনজ ঔষধি গাছগুলোর জিন-নকশা উন্মোচন করা গেলে দেশের কৃষির চেহারা পাল্টে দেওয়া সম্ভব হতো।

২০০৮ সালের শেষের দিকে মালয়েশিয়া সরকার জিন-নকশা নিয়ে গবেষণা করার জন্য একটি বড় গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করে। সেখানে আমার ডাক পড়ল রাবার নিয়ে গবেষণা করার জন্য। তাঁর সঙ্গে হাওয়াই থেকেও কয়েকজন যোগ দিলেন। ২০০৯ সালের নভেম্বরের মধ্যেই তাঁরা রাবারের জেনোম সিকোয়েন্সিং উন্মোচন করে ফেললেন। তখন আরও বেশি করে দেশের জন্য কাজ করার আগ্রহ বোধ করলাম। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। প্রাণরসায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে আমার সঙ্গে কাজ করেন এমন বন্ধুরা শুনেই উৎসাহ দেখালেন। তাঁরা বললেন, যেকোনো মূল্যে এটা হতেই হবে, আমরাই পাটের জিন-নকশা উন্মোচন করব।

২০০৮ সালের জুন মাসে তৈরি হল স্বপ্নযাত্রা নামের একটি উদ্যোগ। প্রবীণ-নবীন মিলিয়ে ৭২ জন বিজ্ঞানী ও তথ্যপ্রযুক্তিবিদ যোগ দিলেন সঙ্গে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অণুজীববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হাসিনা খান ও জেবা সিরাজ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবালসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী যোগ দিলেন। নিজেদের অর্থ ও কারিগরি সহায়তা নিয়ে তাঁরা কাজ শুরু করলেন। উল্লেখ্য, গবেষণার জন্য এঁরা কেউ পারিশ্রমিক নেননি।

ইফতেখার মাহমুদ

গবেষণার ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের কি কোনো সহযোগিতা রয়েছে?

মাকসুদুল আলম

গবেষণার এক পর্যায়ে গিয়ে টাকার অভাবে আটকে গেলাম। তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী হঠাৎ একদিন ফোন করলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করলাম। কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে অর্থসহায়তা দেওয়ার ঘটনা আমাদের হতাশা কাটিয়ে সাফল্যের দিকে নিয়ে গেল। কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে অর্থসহায়তা দেওয়ার পর ৩ জানুয়ারি আরও নতুন উদ্যমে কাজ শুরু হল। গবেষণা শুরুর আগে সবাই লিখিতভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, পুরো গবেষণা শেষ

হওয়ার আগে কেউ কোনো তথ্য বাইরে কারও কাছে বলবেন না। গবেষকদের ৪২ জন সদস্যের সবাই তা মেনে চলেছেন।

ইফতেখার মাহমুদ
সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

মাকসুদুল আলম
আপনাকেও ধন্যবাদ।

সত্তর, আশি, নব্বই, প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের কবিতা

কবিতা

স ত্ত রে র দ শ ক

আ বু হা সা ন শা হ রি য়া র

একলব্যের পুনরুত্থান

এসেছি একাকী আমি একলব্য। দাঁড়িয়েছি অগ্রজের উত্থানসভায়।
দাও দীক্ষা। শব্দশর তুলে দাও ব্যগ্র করতলে। যুদ্ধে যাই।
লক্ষ্যভেদী শরে বিদ্ধ করি যত কূপমণ্ডুকতা। কপটতা।
ধ্বংস করি জড়ভরতের যত দিনরাত্রি। সাম্রাজ্যবিস্তার।
দীর্ণ করি পাথরের দেহ। যেন ফিনকি দিয়ে নামে ঝর্নাধারা।
দাও দীক্ষা। শব্দশর তুলে দাও ব্যগ্র করতলে। যুদ্ধে যাই।

অগ্রজেরা দ্রোণাচার্য। সাড়াশব্দহীন।
প্রাচীন রণকৌশলের পুরাণে উড্ডীন।

ফিরেছি একাকী আমি একলব্য। ফিরে আসি সহস্র ধিক্কারে।
আমি নিম্নবর্ণ। আমি হরিজন। জ্ঞাতিগোষ্ঠী যত সর্বহারা।
তবু মাটি তবু বৃক্ষ তবু জল ডেকে নেয় নিসর্গসভায়।
গড়ি মূর্তি অগ্রজের। দ্রোণাচার্য থিতু হয় মগ্নতার পাঠে।
নিরন্তর পাঠোদ্ধার। গড়ি মূর্তি। ভাঙি মূর্তি। থাকি মূর্তিমান।
ভেঙে ফেলি প্রাচীনতা। স্বয়ম্ভু স্বয়ং করি স্বমূর্তি ধারণ।

সপ্তশরে পঙ্‌ক্তি ছুঁড়ি। মৌনতায় কথা।
ছিন্ন করি অর্জুনির অহং-কুলীনতা।

দ্রোণাচার্য হতবাক! অর্জুনেরও অন্ত নেই বিস্ময়ের। এ কী!
এ কোন একলসেঁড়ে অদ্বিতীয় শব্দশরবিদ্যা হাতে ঘোরে
হানে প্রতি-আক্রমণ কুলীনের ব্রাহ্মণের অগ্রজের প্রাচীন-পুরাণে?
“থামো থামো একলব্য”, অগ্রজেরা ছুটে আসে নিসর্গসভায়,
“তুমি নও শিষ্য। তবু দ্রোণাচার্য গুরু। তিনি পেতেছেন হাত।
ধন্য হও একলব্য। গুরুদক্ষিণায় করো অঙ্গুলিকর্তন।”

জানি না গুরুদক্ষিণায় সিদ্ধি মেলে কি না;
তুলাদণ্ডে মেপে এবার দেব সে-দক্ষিণা।

মনে কি পড়ে পেতেছিলাম ব্যগ্র দুই হাত?
তখন কেউ করেনি পাঠ বোধের ধারাপাত।
পুরাণে আর আস্থা নেই। জীবন খেয়ে বাঁচি।
অসূয়া যেন না-বাঁধে ঘর ক্ষমার কাছাকাছি।
যদিও একলব্য তবু ভুলিনি অপমান।
পুনর্বার হব না তাই ক্ষমাঅন্তপ্রাণ।

পালকে ডুবেছে ভিটে, এবছর পাখিবন্যা হবে

মেদিনীপুরের ফ্রেমে পাখিদৃশ্য বাঁধিয়ে রেখেছি
মুষলধারায় নামে পাখিবৃষ্টি, থই থই ডানার উড়াল
ওড়ে পাখিমেঘ, দ্যাখো, পাখিখামে উড়োচিঠি আসে

অবিরল পাখিধরা, টাপুর টুপুর পাখি চোখের চালায়
পালকে ডুবেছে ভিটে, এবছর পাখিবন্যা হবে।

পাখিভাসি প্রহরান্তে দু'পালক তোমাকে চেয়েছি
মেদিনীপুরে কি আজও পদ্য নামে হই হই রোদে?
ধুলোর সিঁদুর মেখে হেঁটে যায় বিবাহিতা বাড়ি?
শিকারী সভ্যতা ঘোরে ধনুক-প্রযুক্তি নিয়ে হাতে
পাখির কূজন গেছে বনবাসে, সিডিরমে সুরের আফিম
মেদিনীপুরে কি আজও গাছে গাছে পাখিশস্য ফলে?
পালকে ডুবেছে ভিটে, এবছর পাখিবন্যা হবে।

ও পাখিবিক্রেতা তুমি কেন হাঁকো– 'শিকার শিকার'?

তখনও মানুষ ছিল পৃথিবীতে কোনও জাতিসংঘ ছিল না

গরুড়ের রথে চ'ড়ে জাতিসংঘ আসে। বিষ্ণুবরে পুষ্ট হয় বহুজাতিকতা। বিত্তমহাশয় যাবে বিবাহবাসরে। পণ্যপৃথিবীর বউ কুলীনের কেতাদুরস্ততা। মানবতা নস্যিমাত্র, নাকে গুঁজে নিদ্রা যেতে পারো। পৃথিবী ও আরাফাত দুজনাই বুড়ো হয়ে গেছে। 'রাষ্ট্র' কথাটির আজও সুরাহা হল না। জগতে কতক রাষ্ট্রে একাধিক জাতি বাস করে। আবার এমনও আছে, একই জাতি একাধিক রাষ্ট্র নিয়ে থাকে। তাহলে 'মানব জাতি' কথাটির মানে কী দাঁড়াল? পাখিরা সঙ্গীতপ্রিয়, মান্যবর প্লেটোকে চেনে না। টোডাকন্যাদের নিয়ে নির্বাসিত কবি গেছে মেসোপটিমিয়া। পঞ্জায় বাঘের ছাপ, তারই পাশে পার্বতীও নাচে। স্তনে কি যৌনতা শুধু, আঁতুড়ের দুধধানও আছে। তুমি যদি টোডাকন্যা, বুকে কেন বসন-প্রহরা? ধরা যাক, আমাদের দ্যাখা হল কোনও ট্যাবু-টোটেমের দেশে। তখনও মানুষ ছিল পৃথিবীতে, কোনও জাতিসংঘ ছিল না। তখনও নিষেধ ছিল পায়ে পায়ে, আরও ছিল পুরুতেরাজারা। তোমাকে গুহায় রেখে, ধরো, মৃগয়ায় গেছে শিকারী-পুরুষ। মৃত হরিণের দেহ কাঁধে নিয়ে সে আর ফেরেনি। ফিরে এল জাতিসংঘ বহু বহু বছরের পর। তোমাকে পেল না, পেল গুহার বিবর।

সুসঙ্গ দুর্গাপুর ২০০৮

সুসঙ্গ রাজারা নেই; পড়ে আছে প্রাসাদের খোসা
এখনও টংকর মাঠে অগণন ভাঁটফুল ফোটে
ঝাঁক-ঝাঁক কবি ওড়ে দেশওয়ালী পাড়ার আকাশে

কবিকে তেওয়ারী টানে; সোমশ্বর পাঠক টানে না

দুর্গাপুরে এবারই প্রথম পথে সোমেশ্বরী পালা
দুর্গাপুরে এবারই প্রথম ওঠে উর্দিপরা ঝড়
দুর্গাপুরে এবারই প্রথম কবি উদ্বাস্তু শিবিরে
দুর্গাপুরে এবারই প্রথম কাঁদে বন্দি বিরিশিরি

কবিরা উদ্বাস্তু হলে মাঠ-মাঠ খরা নামে দেশে

হ্যালো মেঘ   তুমি কি মৃণাল বসুচৌধুরীকে চেনো?
সৎ ছিল বলে লোকটা সতর্ক ছিল না
অসতর্ক ছিল বলে হিসেবী ছিল না
হিসেবী ছিল না বলে কবি

কবিরা উদারহস্ত; রাজারা ভিখিরি

হ্যালো কালিদাস, হ্যালো   রাজাদের সারিবদ্ধ করো
আমি ও মৃণাল বসু দানসত্র খুলে বসে আছি।

আ ল ম গী র রে জা চৌ ধু রী

এ ভরা ভাদর, মাহ ভাদর

এ সখী হামারি দুঃখক নাহি ওর
এ ভরা ভাদর, মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।
বিদ্যাপতি

তোমার শূন্য মন্দির জুড়ে সজল ভৈরবী

থোক থোক মেঘের ওপারে বিষণ্ন আকাশ
অবিরল জলের প্রপাত, অসীমের মৌন সংগীত।
দূর পরবাসিনী, হায় মরুভূ হাহাকার।
আর ওই যে বৃষ্টিস্নাত সবুজ বৃক্ষ;
দেখ, এ ভরা ভাদর, শূন্যতার দেয়ালে আটকে
থাকে বিদ্যাপতির তৃষিত হৃদয়।

বিশ্বাস কর, আমার কিছুই আটকে থাকে না,
পিঙ্গল পাতায় হলুদ বৃষ্টি দেখছি সেই নাগাসাকি থেকে
আমাজন বন থেকে সুন্দরবন জুড়ে বৃক্ষ কর্তনের শব্দ শুনছি,
সুনামির সঙ্গে দেখা হয়েছে
লবণাক্ত জল ঢুকেছে হাওদায়
ইলিশশূন্য পদ্মার বুক।
কৃষক ফসল শূন্য মাঠে তাকিয়ে থাকে−

আমার দূর পরবাসিনী! ইমেলে জানিয়েছে,−
‘আগামী বসন্তে আমি জর্জকে বিয়ে করবো।’
কবি বিশ্বাস কর, তোমার মতোন হাহাকার কেন?
শ্রাবণ শেষ বৃষ্টিহীন বঙ্গদেশে কেবলি শূন্যতা, অনন্ত ক্রন্দন।
রবিঠাকুরের জলভরা নত বৃক্ষ ধূসর, রাসায়নিক সবুজ।
আর আমার মন মন্দিরে সহস্র পিঁপড়েরা
বলে, ‘হ্যালো। নবীন কৃষ্ণ, হাউ ডু ইউ ডু।’

হ্যালো, হ্যালো

হ্যালো মিচেল

সম্ভাষণে মুখরিত ভেনিস মেলা
শ্যাম্পেনে টুংটাং নীলাভ্র বিকেলে
তোমাকে নিয়ে
চোখে, আবক্ষ মূর্তি
দালি’র প্রলম্বিত সুন্দর।

হ্যালো ক্যাথিরিনা
আমি তোমার কৃষ্ণকায় আব্বাস

হ্যালো, হ্যালো
ওভাবে কাঁদতে নেই ।

বৃত্তান্ত

ছলিমুদ্দিন । বয়স পঞ্চাশ । পেশাদার খুনি । শ্মশ্রুমণ্ডিত ভাঙা চোয়াল । কপালের বলিরেখার ভাঁজে ভাঁজে জীবনপথের সহস্র অভিজ্ঞতা । যৌবনের ফুলেল সময়ে মহাজন-জোতদাররা শিখিয়েছিলো রক্তখেলার বিচিত্র নিয়ম-কানুন । রামদা'র এক কোপে দ্বিখণ্ডিত ধড়, রক্তস্নাত অন্তিম কাঁপুনি । অথবা বল্লমের উড়ন্ত ফলায় হৃৎপিণ্ড এফোঁড়-ওফোঁড় ।

ঘরে তখন নতুন বউ । হন্তারক ছলিমুদ্দিন স্ত্রীর স্তনে মাথা রেখে জেনে নিচ্ছে যৌবনের পাঠ । বউ এসেছে কৃষকের ঘরে । ভাবে ডগমগ বধূটি শুয়েছিলো পাশে । মাঝরাতে পুলিশ আসে । খুনের দায়ে জেল হয় দশ বছর । হত্যার মজুরি একশত টাকা । ছলিমুদ্দিনের স্বীকারোক্তি : পর্দার আড়ালে থেকে যায় চানু মহাজন ।

অলৌকিক নগরীর কাহিনী

নির্ঘুম নগরী এক ।
শতাব্দী জুড়ে যেন এমন ছিলো ।
চুপচাপ ছিলো জীবন
কাজ ছিলো, শ্রম ছিলো,
ভালোবাসা-মমতা-প্রীতি এবং পরাজয়,
চলমান পৃথিবী জুড়ে মৃত্যুর নির্জনতা ।

হ্যাঁ, এভাবে নগরীর নির্জনতার মধ্য দিয়ে
ফিরে এলো প্রিয় পাখিদের দল,
সঙ্গে নিয়ে পত্রপুট
লেখা আছে– সবুজ পৃথিবীর অধিকার
এবং আমার মানবিক বসবাস ।

তোমার ভালোবাসা
পাখির ভালোবাসা
নদীর ভালোবাসা
অলিন্দে বিকেলের মুগ্ধ ভালোবাসা

খুঁজে পেলাম প্রিয় রমণীতে আমার ভ্রূণ ।

অকস্মাৎ বেহেড মাতালের মতো দিগন্ত কাঁপিয়ে
এলো আণবিক প্লেন
থেমে গেলো নগরীর দ্রুততম ঘোড়া
মৃত্যুর মতো নির্জন হলো ধর্মশালা
ভালোবাসার রমণীতে রয়ে গেল আমার ভ্রূণ,
আর চিৎকার করে উঠলো নগরীর অনিন্দ্য সুন্দরী রমণী...
আমার প্রেম
আমার প্রেম ।

প্রজন্ম

এতোটা অবুঝ হতে নেই বালক,
ঐ যে দ্রাবিড়সম্ভূত জনপথ দিয়ে ধেয়ে আসে
গেরুয়া স্পার্টান
ওরা তোমার সহযাত্রী, অনাদি অতীতের
অনুগত দাস, নিসর্গের ক্লীব সন্তান
ঘর্মাক্ত চামড়ায় টান টান ক্ষিপ্র পেশি
চিনে রাখো,
সোনা ও তামাখনির পিঙ্গল ব্যথিত চোখ
চিনে রাখো,
শ্মশ্রুমণ্ডিত চে'গুয়েভারার বাউরি চুল
চিনে রাখো,
তোমার নবীন ভুবন জুড়ে
টুপটাপ ঝরে পরা ভোরের শুভ্র শেফালিকা ।
চিনে রাখো,
মধুপিউ মাতাল কিশোর ।
চিনে রাখো,

একাত্তরের করোটি
নিশানাবদ্ধ ফুটন্ত রাইফেল
মনু মিয়ার বাঁশি
সখিনার উদ্‌ভ্রান্ত প্রণয় ।

মহুয়া মাতাল রাতে জোছনায়
তুমি দাঁড়িয়ে থাকো
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিনে নাও
আমলকি বন
ধাবমান ‘স্যাবর’
চিমনির কালো ধোঁয়া ।

অতোটা চঞ্চল হতে নেই বালক
দেখ,
স্থির কুতুবদিয়ার নিঃসঙ্গ বাতিঘর ।

নাম দিলাম স্বাধীনতা

তোমার মতো আমার কোনো বাহরি বাগান ছিলো না
যে বার দেশে বর্গি এলো,
আমার সন্তানের রক্তাক্ত দেহের ওপর কোনো পুষ্পস্তবক দিতে পারিনি,
সর্বশেষ ভালোবাসার ইচ্ছে ম্লান ছিলো চোখের কর্নিয়া ।
তোমার মতো ভালোবাসার জন্যে এত হিসেব করিনি
প্রতিশোধ নেবো বলে হাতে তুলে নিয়েছি রাইফেল
ভালোবাসার পাঠ,
হিসেব করিনি ভালোবাসার নাম জেনেছি স্বাধীনতা ।
তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রথম যে মন্ত্রোচ্চারণ করেছি
তার নাম দিলাম স্বাধীনতা ।

শ রী ফ শা হ রি য়া র

অসতী সর্পিণী তুই

অসতী সর্পিণী তুই রাখলি ছোবল রাখলি ছোবল এই কপিশ দেহে কোন্
সে পাতায় বল রাখি এ দহন কোন্ সে পাতায় রাখি এ হৃদয়-বিষ সব
পাতা উড়ে গেছে আলো জল থেকে ডানা নিয়ে উড়ে গেছে সব তরুলতা
খাঁচার পোখ্ দেখতে খাঁচাতে শুকায় তার ঠোঁটে নাই জল খাদ্যের কণা কেবলই
বিষের বিষয় ছুঁয়ে আছে দেহ করকা-কাঁটা দেখ বিঁধে আছে চোখে এ দহন
নেবে না কেউ শুশ্রূষার জলে এ বিষ ছোঁবে না জানি শঙ্খের কড়ি কোথায়
আছে রে সেই গেরুয়া বৈষ্ণবী যে দেবে মন্ত্র-ধুলো হৃদয়ের নীলে কৃষ্ণক্ষত
ভাসাবে কে দয়ার্দ্র মান্দাসে!

রাত, রক্তজবা পাথর হয়ে নেমে আসে চোখে

আখড়ায় আবিষ্ট রাত
রাত, রক্তজবা পাথর হয়ে নেমে আসে চোখে

সমগ্র সত্তা ব্যেপে সহস্র ক্ষুদ্র মাছ
ঢুকে পড়ে অ্যাকুরিয়াম ভেঙে
তখন ভিতরে মাছের সাঁতার– বুদ্‌বুদ্ ফেনা
শ্যাওলার শব্দডানা নড়েচড়ে ওঠে

চাঁদের চৈতন্য গিলে ভাঙা সাঁকো পড়ে আছে
এইটুকু জল-জ্বালা পার হবে কে?
তবু তাসঘরের হাওয়া নুলো পাখির
কণ্ঠ বেয়ে মাঝপথে নামে
হৃদয়ের জলপত্র ছিঁড়ে আমি কাকে
তুলে দেবো খ রাতের পৃথক মধ্যযামে!

রক্তে লালিত নুন– দ্বন্দ্বের পালিত কানামাছি
উত্থানে ছেঁড়া গান নিয়ে ডুবে যায় বালুর বিন্যাসে

আখড়ায় আবিষ্ট রাত
রাত, রক্তজবা পাথর হয়ে নেমে আসে চোখে।

বটপাতা যতটা বিদ্রোহী

বটপাতা যতটা বিদ্রোহী, তা তো বায়ুর প্রভাবে
আর আয়ুহীনতার হলুদ বর্ণ যখন লাগে
তাও হাওয়ার একান্ত কারসাজি

আজ বটপাতা আর বায়ুর ভূমিকা
সকল চলাচলে সকল পথে
অনুধাবনে সঠিক খুলবো বলে
নিজেকে বটপাতা বানিয়ে বায়ু-বিস্তারে
ছড়িয়ে রাখি।

পাখিদিন

আজ তবে পাখিদিন!

রৌদ্রনাচে ডানা খোলা, হাওয়ায় হাওয়ায়
পালকের সাঁকো উড্ডীন

আজ হত্যা-দিবস নয়!

সকল প্রস্তুতি খুব অতিথিপরায়ণ, নবিশ–
গৃহিণীর মেনুতে সবুজ নিরামিষ।

বাজারধর্ম

বাজার, বেশ্যার অধিক লাস্যময়ী
কেবল এ-গলিতে আমি ভ্রান্ত ক্রেতা
কী যে কিনবো আর কী কিনবো না, এ
দু'টানা কাঁপায় সত্তা অবধি, যদি
পকেট থেকে ফসকে যায় হরিণ
ছবি, তবে আখেরে কারই-বা ক্ষতি
এ-চিন্তায় কপালে ঘামের পরিধি
বাড়ে, তবু আমাকে যেতে হয় রোজ
চাপানো চাহিদার নাছোড় জঙ্গলে

বামনচক্রের এ-ক্রিয়ার ভিতরে
কোথায় নিজের ছায়া, মর্মদর্পণ
ভাঙছে খানখান পুঁজির কীর্তনে
নানারঙ পণ্যের বিবিধ গর্জনে
কেবল লিঙ্গ খ'সে নিজের অজান্তে
তুলাদণ্ডের রেখায় দাঁড়িয়ে, জানি

ক্রেতা তো সর্বত্রই নাজেহাল, বিলা
সময়, রাধাহীন গোপিনীর লীলা...

ন ব্ব ই য়ে র দ শ ক

না ভে দ আ ফ্রি দী

রেলরোডে উঁচু অন্ধকার

মেঘহীন ডিম
প্লাস্টিকের দুধ, মাছ
গাভীন মুরগি
বদলে দিচ্ছে পাকস্থলী, বাল্ব, মগজ

বদলে দিচ্ছে রক্ত, হৃদ্‌পিণ্ড
সবুজ উষ্ণতা

আমাকে পান করছে এই প্রকৃতি

যা কিছু শুনছি–প্রতিধ্বণি
যা কিছু দেখছি–প্রতিচ্ছবি

যা যা অনুভব–সবসময় সত্য
যা যা অনুভব–নিরুত্তাপ–ব্যাকুল–

যা বয়ে চলছি
সবকিছুর ওজন
সবুজের ভেতর দিয়ে
দূরত্বের নীলে

আমাকে পান করছে এই প্রকৃতি

এর একটি নৈঃশব্দ–
একটি জীবন, ঘুরছে আমার চারদিকে

সিস্টিন চ্যাপেল

[ফ্রেস্কোস চিত্রাবলি আদি অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার কাজ
সম্পর্কে, পোপ দ্বিতীয় জন পল-এর বক্তব্যের অনুরোধ]

ফ্রেস্কোস দৃশ্যরা, সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়
ঈশ্বরের আত্মার জগতে

জীবনের সত্য, মানুষের ভেতর চোখ মেলে

২.
পুনরুত্থিত যিশু
পৃথিবীর ভবিষ্যৎ

অনুভব আর প্রার্থনার কেন্দ্রবিন্দু

জোনাকির আগুন

জোনাকির আগুন
দিব্য ক'রে দেয় মাটির শরীর

ব্যাঙের ছাতা
নির্জন দূরের ডাকঘর

সবুজ রক্ত মাংস ব'য়ে যাওয়া নদী
হেঁটে যাওয়া বৃক্ষ

২.
চোখ–
অনুভব করে
এই জ্বলে ওঠা

গাভী ও সময়

পৃথিবী এক সবুজ গাভী
সূর্য এক রাখাল

গাভীর ভেতর শিশু–দুধ–
সূর্যের ভেতর সবুজের উত্তরাধিকার

সময় এক বিস্ময়কর তরল পাথর
ঘাসের ভেতর–
মৃত্যুর মতো ওজন তার

ঘুরে বেড়াতে পারে–
বদলে যেতে পারে–

সা জ্জা দ সো হ রা ব

ফুলগুলো

২.
যখন বালক ছিলাম আমি
কড়কড়ে রৌদ্রের সকাল ভালো লাগতো।
তখন বাতাস বহে কিশোর বয়সের মতো নতুন।
আর এক রকম দুপুর আছে; মন ধুধু করা–

সেরকম দুপুরে পালিয়ে যাওয়ার
ভীষণ ভয় ছিলো । এখনো ।

৩.
নিঃসঙ্গতার পাশে কতোদিন দেখেছি;
একটি বিড়ালকে বসে থাকতে ।
চুপচাপ ।
কতোদিন আমি–
নিঃসঙ্গতার কাছে যেতে চেয়ে
বিড়াল'কে নিয়ে খেলা করেছি ।

৫.
অপেক্ষা করছি নতুন কিছু বেদনার জন্যে ।
তা থেকে যে সকল
ফুল ফোটার প্রতিশ্রুতি আছে
অপেক্ষা করছি সে সকল দেখবো বলে ।

১১.
তুমি
আমার কুড়িয়ে পাওয়া দিন ।
আমার কাছে রইলো তোমার
চিরকালের ঋণ ।

২৪.
এই শহরে একজনই কবি আছে ।
সে থাকে পলাতকের মতো ।
রৌদ্র যেমন :
আসে আবার ফিরে ।

২৫.
কোনো কোনো বীর আছে
কেবলি হেরে যায় ।

মা হ ফু জ রি প ন

জলকীর্তন

মধ্যাহ্ন সূর্যের তেজ আমাকে বার বার জলের কাছে নিয়ে যায়। পিপাসার শরীরে লোনা ধরে।
জোয়ারের আশায় মন মাতায়, ঝাঁপায় দুনিয়ার প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। নদী নারী মৃত্তিকা জলকীর্তন করে। পিপাসাকাতর শঙ্খচিল মেঘেদের বর্ষার গান শোনায়। আদিম পৃথিবী থেকে জলের স্তর নেমে গেছে সীমা থেকে শিলায়। প্রকৃতির বৈরিতায়– বিপ্রলব্ধে মধুমতি, পদ্মা বিহনে কুমার। কালের মৃত্যু ঘটে, ঘন হয়ে আসে মহাকাল। জলমঙ্গলের আশায়– উদাসী বেহুলা আসন পাতে অর্বাক বৃক্ষের তলায়। বৃক্ষ সবই দেখে, মৃদু হাসে আবার নদী হয়ে যায়।

মধ্যরাতের সুরবালা

মাঝরাতের পাখিরা উড়ে যায় দূর আকাশে। বাল্যবন্ধুর মতো শুভ্র জ্যোৎস্না চিনিয়ে দেয় ঘরে ফেরার পথ। বাতাসে ভর করে জলকাদা ঘ্রাণ। নদীতে জলের প্রসূন আজ। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যায়– হায়রে গন্ধকুসুম। বহমান নদীর দিকে তাকাই, জল ঝরার শব্দে নৈঃশব্দের ঘুম ভাঙে। আমার গোপন পাপগুলো শুষে নেয়– মধ্যরাতের জলধারা। মাটির শরীর হেঁটে যায় পূবের দিক। আদি শয্যা– শ্মশান ঘাটে পুড়তে থাকে সাধের শরীর। গহিন অঙ্গারে ক্রোধের জ্বালা– জ্বলে। সুরবালার কান্নায়– ভোজবাজির মতো অন্ধকারের ঘণ্টা বাজে।

জলরঙয়ের ইডিপাস

অনিশ্চিত এ ধূসর কক্ষপথে– ফিরে আসে যুগল। গন্তব্য মনুষ্য কক্ষপথ। বাদল রাতের আঁধারে ভুল করে সাধের যৌবন, হারিয়ে যায় ভূগোল– নিয়তির জলরঙয়ে! অতঃপর– তারা শুধু গেয়ে চলে হাহাকারের গান। অদৃশ্য বৃত্তের মাঝে মলিন হয় ধুলো। তাদের কোনো অবসর নেই শুধু গেয়ে চলে আর– চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। মনুষ্য নীরবতায় জাগ্রত

হয় পাপ বন্ধন অপেক্ষা প্রহর উড়ে যায় বন্দিশালায়। অবশেষে– মৃত্যুর ফসল মাঠে শস্যগুলো সব মাঠেই ঝরে যায়।

মৃত্যুঘ্রাণ

নদীতে মিশে যায় স্নানের জল। বৃক্ষ মায়ায় কাঁদে নিথর শরীর। উড়ালদেয় নীলকণ্ঠ বাউল জীবনের বীক্ষণে। অসীম তৃষ্ণায় জড়ো হয় অন্তিম সময়। সে নিজে কাঁদে; আকাশকে কাঁদায়। শিখণ্ডি নগরে ডুবে যায় সাঁঝের বেলা। হিম হয়ে আসে পদ্মবিলের জল। পাঁচ-দোহার আসন পেতে বসে– আসে না পরাণ সাঁই; বাজে না সাধের দোতারা। সুরের মায়ায় অন্ধ ব্রতচারী হারিয়েছে পথ, ডাকিনী সময় জড় হয় যমদূতের মতো। ধাবমান মৃত্যু ফিরে যায় মাটির ঘরে।

তৃতীয় ধাপের দূরত্ব

মেঘের বালিশে মাথা রেখে গল্পের অন্ধেরা আজ কল্পনাদীপ্ত। পুরাকালের সুকুমার নন্দন আজ চিত্তের গভীরে। মস্ত বড় অভিমান থেকে তার এ তৃতীয় ধাপের দূরত্ব। গল্পের খোঁজে আগামীর সূত্রধর। কোথায় লুকিয়ে অভিমানী পদ্মমুখ– আজ শুধুই ছায়ার ছায়া মাত্র। সততার বিশ্ব খাতায় আদিম থেকে আধুনিক রাশি-রাশি সাহিত্যের পথ আজ পদ্মাবতী। কালের আন্দোলিত বাতাসে তাঁর পায়ে চলার শব্দ– আমাদের সম্বল! তাকে খুঁজতে গিয়ে একটি নতুন কবিতা পেলাম, অভিমানীকে আর পেলাম না!

হি মে ল ব র ক ত

আবাস

একান্নবর্তী পরিবার নিয়ে দুঃখ বের হয়েছিলেন নৌ-ভ্রমণে ।

দাঁড় টানতে-টানতে বিষাদ নামের যুবকটি

কানে গুঁজে রাখা আলস্যে ঠোঁট ছোঁয়াবার প্রস্তুতি নিতেই
বেদনা নাম যে-মেয়েটির, খুব স্পষ্ট স্বরে বোলে উঠল :
উঁহু, এখন ওসব চলবে না– জোরে চলো, জোরে...

কষ্ট খুক্ খুক্ কোরে কেশে নিয়ে পরিবেশটা পরিষ্কার করলেন ।
অকস্মাৎ, হতাশা নামের ছোট্ট মেয়েটি কেঁদে উঠল আর্তস্বরে
এক বাটি চোখের জল এনে তার সামনে রাখলেন বিষণ্নতা ।
সত্যি, তাদের সবারই খুব তাড়া– ঘরে ফিরতে হবে ।

মানুষের বুক ছাড়া ওরা সর্বত্রই বড় শ্বাসকষ্টে ভোগে...

উড়ালের দিন

সমর্পণের এক পাশে রেখে ঘাম
অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছি নদী–
নদীর দু'পাড় দুই ঠোঁট, আর তার
মাঝে চকচকে দাঁতের মতোই জল ।

জল ভিজে যায়, জল ভিজে গেছে রোদে–
ঘুড়িময় দিন প্রিয় ঢেউ খুঁড়ে খুঁড়ে
উজ্জ্বল আয়ু, উজ্জ্বলতম ডানা ।

ইকারুস তবু পতন-মেধাবী মোম
আত্মনাশের বৃন্তে ফোটায় ব্যথা–

ব্যথা ঝরে যায়। ব্যথা ঝরে যায় নাকি?

ঘুমে ও ঘৃণায় যতোটুকু মৌলিক
উপুড় করেছি সেটুকু নিজস্বতা।
সমর্পণের এক পাশে সেই ঘাম,
অন্য প্রান্ত পুড়ে গেছে জল-তাপে।

দেহতত্ত্ব

কাদায় ফুটল কলমিলতার কুঁড়ি
দাম জানি না, ঘ্রাণ বুঝি না, দেখি–
দেখতে-দেখতে চোখ পড়ে যায় জলে,
তুলতে গিয়ে কার বুকে হাত রাখি!

রোদের রাগী মেয়ের এত ক্ষুধা
জাপটে ধরে শীতের মতো জ্বরে।
চুমুতে বিষ তখন ছিল না তো
এখন কেন শরীর এমন করে!

শরীর থেকে তৃষ্ণা দিলাম খুলে,
তাকিয়ে দেখি– চোখ পুড়ে যায় জলে...

শোষণ সংক্রান্ত কাঁচামাল

ভাঙা ঘর থেকে যিনি প্রবেশ করলেন আখক্ষেতে, তাঁর শর্করার সংকেত জানা নেই। তিনি শুধু জানেন– আখ থেকে পয়দা হয় চিনি। চিনি থেকে টাকা। এবং টাকার বাম্পার ফলন মানে বউয়ের চিনিমুখ চিনিরাত সন্তানের চিনি-মাখানো হাসি।

তাঁর পরিচ্ছন্ন জ্ঞানের পথে বহু ভাঁজ প'ড়ে অবশেষে লুট হয় ঘুম হাঁড়ির নাদুস ভাত বউয়ের লাবণ্য সন্ত

ানের ইশ্‌কুল-পালানো শৈশব। এমনকী, সামান্য ব্যয়ের জন্মনিরোধটিও।

শর্করার সংকেত তাঁর জানা হয়নি। শুনেছি– আজকাল আয়নার সামনে দাঁড়ালে তিনি শুধু আখের ছোবড়াই দেখতে পান।

বিপণন

বাজার মাতাল করে নেমেছে ঢল...
ক্রেতা ও বিক্রেতা একই লোক, বহু লোক–

হাত বিক্রি করে কেউ কিনছে হাতিয়ার
মাথা বিক্রি করে কেউ কিনছে মুকুট
বিশ্বাস বিক্রি করে কুকুরের জিভ পেতে আছে একজন
কিনবে বন্ধুত্ব!

আমার তো নেই কিছু– কায়া নেই, ছায়া নেই...
বাউল হাওয়ার মতো শুধু ঘুরে ঘুরে দেখি–
কার কতো লাভ হলো বেচা ও কেনায়!

অভিমান

জানো মা ঘেন্না লাগে দেখে
ছেলেটি তাকিয়ে থাকে শুধু
বিকেলে পাশের ছাদে উঠে
কী যেন চোখের স্বরে বলে

মা ওকে দাও না বকে খুব!

দুপুরে ক্লাসটা শেষ করে
আমি তো ছাদেই এসে বসি

ও কেন   মিলির কাছে যায়
মিলি কি   আমার চেয়ে ভালো

মা ওকে   বকতে গেলে কেন?

ম মি ন মা ন ব

ধর্ষকচিহ্ন

ধর্ষকদের শিশ্ন থাকে
পুরুষ হিসেবে আমারও আছে

কেউ ধর্ষিত হলে নিজেকে কেমন ধর্ষক ধর্ষক লাগে

আমাকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারো
ধর্ষকচিহ্ন হয়ে
যত দিন শিশ্নটা থেকে যায়

ইতিহাসের জাদুবাক্স

কলম্বাস তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে ইতিহাসের বাক্সে;
তুমি আলেকজান্ডারের নাম শুনে
মহামতি মহামতি মহামতি বলে উঠে দাঁড়াও,

জানতে চাওনি তোমার পিতামহের হত্যাকারীকে,
হত্যা শেষের মিষ্টি বিতরণে তাই মিলিত হও তুমিও;

যারা ইতিহাসের পাঠ্যসূচিতে ঘুমবিদ্যার বীজ ছিটিয়ে দিয়েছে
আরা যারা ইতিহাসের ছাত্র হতে চায়নি

স্বপ্নে পাওয়া ভায়াগ্রা খেয়ে তারা একদিন ধর্ষণ করবে তাদের মাকে বোনদেরকে
এবঙ নিজেকেও

সার্কাসের বাঘ

খুব শীঘ্রই সমস্ত সুন্দরবন সার্কাসের আওতায় আনা হবে–
বলে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত সার্কাসমন্ত্রী যেই জাতীয় সঙসদ কাঁপিয়ে তুলল

একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার চলে আসল নীলক্ষেতের মোড়ে
দৌড়াতে থাকল ছাপড়াঅলা বইয়ের দোকানগুলোর উপর দিয়ে
কোনো বাঁশ কিংবা দড়ির উপর নয়
দিব্যি দৌড়াতে থাকল শূন্যে
কোনো সার্কাস মেয়েও এমন সার্কাস দেখেনি তার জীবনে

বিক্রির জন্যে নয়
লেখা
বইয়ের দোকানে ঝুলতে থাকা
সংবিধানের ইঙরেজি-বাঙলা সবগুলো কপিতে ঝরঝর করে ছেড়ে দিল
গত পাঁচ বছর ধরে আটকে রাখা প্রস্রাবের চাপ

ফিলিস্তিন : কোথাও কোনো শিশু নেই

বিচ্ছিন্ন হাত-পা নিজে নিজেই জোড়া দেয়
তারপর সামনের দিকে আগায়
এগুতে এগুতে হয়ে ওঠে একজন হামাস

তারপর সে আর শিশু থাকে না
রাফা খান ইউনুস গাজায় কোথাও কোনো শিশু থাকে না
পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে হয়ে ওঠে একজন হামাস
তাই ভাইকে কবরে দাফন করে
রকেট তাক করে হায়ফার দিকে
তাক করতে করতে নিজেকেই ছুঁড়ে মারে তেলআবিবে

বাবার ছিটকে পড়া চোখ দুটি মাটি থেকে তুলে এনে
নিজেই নিজের অক্ষিগোলকে বসিয়ে দেয়
দাদিমার গল্পবলা কণ্ঠটা কণ্ঠনালিতে বসিয়ে দেয়
বন্ধুর থেঁতলে যাওয়া কলিজাটা
নিজের কলিজায় বসিয়ে দেয়
আর শত্রুর হামলায় গুঁড়িয়ে যাওয়া বাড়ির ইটগুলো
পর পর সাজাতে সাজাতে হয়ে ওঠে একজন হামাস

ফিলিস্তিনে কোনো শিশু থাকে না
মায়ের দুধ ছাড়ার আগেই শিখে ফেলে পাথর ছোঁড়া
তারপর হামাগুড়ি দিতে দিতে হয়ে ওঠে একজন হামাস

গাজা শহর

ফিলাডেলফি সড়কে শোঁ শোঁ টহল দেয় ইসরাইলি ট্যাঙ্ক
ভূমধ্যসাগরে ফোঁশ ফোঁশ করে শত্রুর যুদ্ধজাহাজ
মনে হয় গুঁড়িয়ে যাওয়া গাজা-ই আমার শহর
বোমা হামলায় বিধ্বস্ত দালানের নিচে আটকে আছেন
আমার মা
আর আমার বাবা
বিকেলের হাঁটা হাঁটতে গিয়ে
রক্তে চুবচুব হয়ে ফিরে এসে দাঁড়িয়ে আছেন
বিচূর্ণ শহরের মোড়ে
কেন মনে হয় আমার ছটফটে ছেলেটা চিৎকার করছে
আলসিফা হাসপাতালের রক্তমাখা সিটে

মনে হয় বুকের ভিতরে গাদাগাদি শুয়ে থাকা
পিতামহের দালানটা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে
সবখানে সারি সারি সাজানো হয়েছে ফুটফুটে শিশুদের লাশ
কালো ধোঁয়ায় ছড়িয়ে পড়ে চোখে মুখে ফুসফুসে
দুঃখের দিঘি কেন থৈথৈ করে ওঠে
বারবার মনে হয় এই গাজা-ই আমার প্রিয়তম শহর

একজন হামাস যোদ্ধার প্রতি

সুড়ঙ্গের ভিতর হাঁটতে হাঁটতে তোমার চোখে সবুজ শস্যের টকটকে সূর্য। পশ্চিম তীর এখন তোমার পুব দিকে, মিশর-জর্দান মাড়িয়ে তুমি পার হও তোমার : গাজা থেকে রামাল্লা!

এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে
এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি
এ ঘর থেকে ও ঘর
একজন থেকে আরেকজন...

দশদিক থেকে ঘিরে ফেলা ভূমধ্যসাগরীয় পিতৃভূমিতে তুমি বন্দি; ফিলিস্তিনের মানচিত্রের মতো তুমি রক্তাক্ত, পাখি পাখি খেলায় ঝাঁঝরা হয়ে গেছে তোমার হৃদপিণ্ড, পাকস্থলি, কণ্ঠনালি, চোখ আর মুখমণ্ডল। মহড়া আর মেলার মতো তোমাকে বেলুন ভেবে খেলে, বন্য হাঁস ভেবে খেলে, খেলনা পুতুল ভেবে ওরা খেলে!

তবুও, অপরাজিতার মতো মেলে দেয়া তোমার ডানা; স্বপ্নে এবং ক্রোধে ওড়াউড়ি কর

শত্রুর হেলিকপ্টারে
বোমাবাহী ড্রোনে
স্বদেশের মিসাইল আকাশে

বী রে ন মু খা র্জী

বিচ্ছিন্নতার গান

হেঁটে হেঁটে চলে এসেছি অনেকদূর–
ক্রম পরিবর্তনে আপন সৌন্দর্য হারানো ধূসর বিকেল
তাচ্ছিল্য সত্ত্বেও গোত্র অভিযানের উপঢৌকন দাবি করেনি
বরং বিভ্রান্ত মুহূর্তে ছড়িয়ে দিয়েছে বিবাগী পাতা;
উড়ে উড়ে যারা ক্রমশ হারিয়ে ফেলেছিল

মধ্যবর্তী সময়ের ধ্বনিগুচ্ছ!

নির্মাণের মধ্যে একাকী ডুবে থাকা দলছুট ঘাস
এতদিন পরিচর্যা করেছে প্রতিশ্রুতির ফোয়ারা;
সে জানতো না–নির্বাসিত আকাশে উঠবে উজ্জ্বল তারা
সে জানতো না–নিশ্চিত অধোমুখে
সহসা উড়ে যাবে বৈশাখের রঙ!
প্রকাশ্য শক্তি নয়, আজ খেলা হোক মহিমান্বিত আগামীর
পথ শেষে নিকটবর্তী হোক বিরুদ্ধ সাঁকো
যৌথদৃষ্টি আর প্রিয় অপরাহ্ন ঘিরে নৃত্যরত পাখিরা
মোহমুক্তির রঙ নিয়ে উড়ে যাক মনোসরণি বেয়ে...

অনেকদূর এসেছি চলে–তীর ছেড়ে
যেভাবে বিচ্ছিন্ন হয় নোঙর, মাঝ সমুদ্রে!

মধ্যহেমন্তের গোপন অর্কেস্ট্রা

সব পথ গন্তব্যে পৌঁছে না–এ জাতীয়
উপপাদ্য নির্মাণের প্রস্তাবনা দীর্ঘায়িত হলে
যার অনুসিদ্ধান্ত নিরর্থকতা তৈরি করে
প্রতিরাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে একপ্রস্থ সঞ্চয়ী মুখ
অনুচ্চারে ডাকি তাই; যার সঙ্গে গাণিতিক কোনো
সু-সম্পর্ক নেই; অথচ রাতের পৃষ্ঠাজুড়ে
সে বাজায় অন্যগ্রহে–মধ্যহেমন্তের গোপন অর্কেস্ট্রা!

বৈচিত্র্যমুখি না হয়ে যে পথ, ক্রমাগত
বহুগামী পোশাকে চিত্রিত করে নিজেকে
তার আড়ালের মধ্যবিন্দু কোনো সমীকরণ মানে না
এজন্য গোপনবিন্দুর পেলবতা ঢেকে যায় গাঢ় কুয়াশায়
হেমন্তের ভেজা ঘাসে জমে ওঠে বাষ্পীকৃত ভাবনা।

নদীর তলদেশ, পাহাড়চূড়া কিংবা মেঠোপথ ঘেঁটে
যে সম্ভাবনা পাখা মেলেছে ইতিহাসে
তার কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করেছি ব্যাকরণসিদ্ধ সরলরেখায়

তবু পথ-ই আমাকে উপপাদ্য শেখায় প্রতিক্ষণ
নিরর্থকতা সত্ত্বেও যার ত্রিকোণে আমার বসতি
যদিও ঘরামির ঘর জোটে না, কস্মিনকালে!

আর্যাবর্ত

যেমন সময় হেলে যায় চিন্তার অনুকূলে
রাতে ফোটা পাতারা হাসে অনুপম আলোয়
এক মুঠো মেঘ উড়ে যায় নিঃশব্দে;

যেমন আজ্ঞাবহ ঘুড়ি ওড়ে চৌরাশিয়ার বাঁশিতে
গুমরে ওঠে পুণ্যবতী চোখ বেদ ও সংবেদে
অগোচরে রাত নামে আর্যাবর্তের শূন্য উঠোনে;

এ জাতীয় বিভ্রম আর সম্ভ্রমে দ্বিধাগ্রস্ত সমকাল আমার
স্থির বিন্দুটাকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় একদল অন্ধ
সূর্যাস্ত রেখা ধরে দৌড়ে চলেছে–
আগমনী ধ্বনির বাহক পাখিটিও জ্যোতির্ময় নেশায়
সিটি বাজিয়ে যাচ্ছে সময় পরম্পরায়!

একদিন এভাবেই দ্বিধান্বিত আর্যাবর্তে
সংগ্রামের ইশারায় অপেক্ষমান ছিল পাণ্ডবের শৌর্য
উদগ্রীব কর্ণের চোখেও ছিল সময়ের কুহক
এখন যেমন তুমি আর আমি, মুখোমুখি দ্রোণাচার্য ।

চ রু হ ক

ধূলি

পরতে পরতে ধূলি জমে আছে
এ ধূলি যে সরাবো কী করে
                    নিরুপায় হয়ে
ধূলিগুলো মুক্তো হয়ে যায় ।

রাখাল

কে ওখানে? কে বাঁশি বাজায়?
কার বাঁশি শুনে জলকুমারীরা আসে
কাকচক্ষু নীলজল ফেলে
রুপালি চাঁদের ওড়নায় নিজেদের ঢেকে
খুঁজে ফেরে জাদুকর রাখালের যমজ দোসর ।
কে ওখানে? কে কাঁদে জোছনায়?

তোমাকে পাবো না তাই
বাঁশিতে তোমাকে ভরে নেই ।

ডুব

আমাদের হাতের তালুতে
এখন দেশের মাটির গন্ধ।
সেই গন্ধে ডুবে যেতে থাকা
শুধু। ডুবে যেতে যেতে ফুটে উঠতে থাকবে
মহাকাশ, নীহারিকা
আলোর মেখলা।
আমাদের চোখ মিশে যায় ধ্রুবতারায়
এবং মাখনগলা নীল চাঁদ জ্যোৎস্না ঝরায় চুপিসারে।

আমাদের হাতের তালুতে আজ
আঁতুড়ঘরের গন্ধ,
আর তোমার দুচোখ যেন
অজস্র মানুষের হৃদয়ের জানালা।

দহন

মোমটা নিভিয়ে দাও
আবছায়া দিনগুলো ঝরে পড়ছে এখানে,
মোমটা নিভিয়ে দাও
জীবনের টুকরোগুলো ঝরে পড়ছে এখানে।

এই ক্রান্তিবেলায় আর কতকাল?
তকাল পাথর চোখে আগুন?
এবং আগুনের সন্তান এই ধ্রুবতারা?

ঘোমটা সরিয়ে নাও, নাও
সমুদ্রের নোনা জলে পিপাসার পাল পুড়ে যায়
অজান্তে কখন তাই গোলাপ বাগানে বিষ ঢালি ।

চাঁদ দেখা

অনেকদিন চাঁদ দেখা হয়নি আমাদের, তাই
আজ এসে দাঁড়িয়েছি তোমার বারান্দায়,
জুঁইগাছটার সামনে ।

একটু পরেই পায়ে পায়ে সন্ধ্যা নামবে, ভূতের গলিতে ।
অতঃপর ঝুমকো জবার মতো ফুটতে থাকবে তারা ।
খুব মনে পড়ে দাদাভাই-এর কথা ।
দাদাভাই ঝুড়ি বুনতেন আর এক হাতে তসবি
আমরা বাঁশের মাচায় শুয়ে থাকতাম ।
এবং দাদাভাই সুরা আর-রাহমান গড় গড় করে আওড়াতেন ।
তারপর বড়ো একটা চাঁদ উঠতো ।
মিহিদানার মতো গলতে থাকতো রাত
এবং আমরা কোনো জুঁইগাছ ছাড়াই
জুঁই ফোটার তীব্র গন্ধ পেতাম ।

পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

ঋতুচক্র

আমি ঋতুরাজ বসন্তের রাজপথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি গন্তব্যবিহীন। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই, ভালোই লাগছে। কোকিল আমাকে কুহু-কুহু রবে গান শোনাচ্ছে, অন্যান্য পাখিরাও। পথের ধারের তৃণ-লতা-গাছ দান করেই চলছে অবিরত ফুলের সৌরভ। দখিনা বাতাসে আমি যেন একাকার হয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ বড় এক ঝড়! ঝড় আমাকে উড়িয়ে নিয়ে চলছে তো চলছেই। জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি ততক্ষণে। যখন আমার জ্ঞান ফিরল তখন দেখলাম চলে গেছি সবদিক থেকে ভিন্ন এক নতুন রাজার রাজ্যের নববর্ষের দিনে। গ্রীষ্মের রোদ্দুরে কাঠফাটা পথ ধরে ফিঙে তৃষ্ণা নিয়ে বর্ষার দিকেই এগোলাম অতঃপর.....গুড়ুম গুড়ুম মেঘ ডাকলো, বর্ষণ হল। আমি বর্ষায় প্রবেশ করলাম। কাদা-পানির মাঠের পথ ধরে আমি যাচ্ছি। ভাঙলো নদীর বাঁধ। বন্যাজলে হাবু-ডুবু খেয়ে খেয়ে শরতের চরে গিয়ে উঠলাম। কাশফুলের নরম ছোঁয়া আমাকে সজীব করে তুলল। মেঘের ভেলা আমাকে হেমন্তে নিয়ে গেল। সোনারঙ ধানক্ষেত দেখে আমি মুগ্ধ হই। কৃষাণপাড়ায় কৃষাণীর হাতে নতুন চালের পিঠা-পুলি খেয়ে, শীতের চাদর পরে, পত্রঝরা বন দিয়ে যেতে যেতে আমি পুনরায় বসন্তকে খুঁজে পাই।

আদিমতা

সবাই যখন সভ্য সমাজ বলে
চিল-শকুনের লড়াই কেন চলে?
খাদ্য নিয়ে যুদ্ধ লেগেই রয়

কাক-কুকুরের মতোই মনে হয়।

সিংহ-বাঘের হিংস্র আচরণে
বনহরিণী শিকার করি বনে।
মাছরাঙা ও বক ধ্যানে যাই

তরুণীমাছ ঝাপটে ধরে খাই ।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে বসে আজও
কেন করি বর্বরতার কাজও?
ভাবতে গেলেই শঙ্কা বেড়ে যায়
মধ্যযুগে ফিরে যাচ্ছি হায় ।

মাঠ-মেঘ

মাঠ বলে, ওহে মেঘ চেয়ে দেখো
দিন দিন কেন যেন রুক্ষ-শুষ্ক হয়ে যাচ্ছি আমি
ফেটে হচ্ছি চির চির, বেড়ে যাচ্ছে জলের তিয়াস
অনাবাদি হয়ে যাচ্ছে মাটি
বহুদিন পাইনি তো লাঙ্গলের ফলার আরাম
ভুলে যাচ্ছি, একদম ফসল উৎপাদনের স্বাদ ।

আকাশের বুক দিয়ে শাদা-কালো মেঘ
হেঁটে যেতে যেতে বলে 'ও' মাঠ বলো না আর
ক'টা দিন একটু অপেক্ষা করো
তারপর বৃষ্টি হয়ে নেমে এসে ভালো করে ভেজাবো তোমাকে
ঘুচে দেব জলের পিপাসা, মুছে দেব সকল ফাটল
চিন্তা করো না । কৃষক তোমাকে আবার
আগের মতোই করবে আবাদ
সবুজে উঠবে ভরে তোমার শরীর ।

জিয়াবুল ইবন

সজনেফুল

সজনেগাছের সাথে অনেকের অনেক রকম সম্পর্ক রয়েছে
যেমন–
ডালের সাথে
ডাঁটার
চিরন্তন রন্ধন
সজনেফুলের ছোপালো মায়া
আমাদের আঙিনায় বটেশ্বর-ওয়ারীর ছায়ার সমান

পাথরকুচি

কবি সফি সরকারকে মনে পড়ে...

একটি গাছ। গাছটি পাথরকুচি
একটি বাগান। ফুল আঁকা। ক'জনই বা বুঝতো ফুলের ভাষা?

গাছটি তবুও ক্রসফায়ারে গেলো
মিডিয়া বললো, সে বড়ো কুখ্যাত ছিলো

গুলিবিদ্ধ দেহটিকে নিয়ে পাতারা তো শেষ পর্যন্ত মাটিতেই ঢলে পড়লো
রক্তভেজা বিশাল সে মাটি জন্ম দিলো কচিকাঁচা সবুজ চারা

গাছটি যে পাথরকুচি–
ক্রসফায়ারের আগে কে-ই বা জানতো তা

আমরা তিন ভাই

আমার দুই ভাই সেলাই শ্রমিক। সুই-সুতোয় মন মিশিয়ে
সেলাইয়ে-সেলাইয়ে
সম্পর্কসূত্রে বাঁধে সোল্ডার, নেকজয়েন্ট, নেকটপসিন, স্পিজয়েন্ট, বডিডাউন–
আরো কতো কী! পাশাপাশি খুঁজে ফেরে অর্থনৈতিক সম্পর্ক
উন্নয়নের নতুন সুই-সুতো

আমি কেবল সরে সরে যাই
দূরে
ফিরে ফিরে তাকাই পিছু বারবার
কী এক আজব জীব!

রাত্রে যখন একই বিছানায় শুই তিন ভাই
তখন আমারও মন চায় নতুন একটি সুতোয় মালা হই আমরা তিনসহ
অসংখ্য ফুল

দ স্ত্য ন ই স লা ম

আয়না শুধুই আয়না

আয়নার বিপরীতে আয়নাকেই প্রদর্শিত মনে হয়,
আয়নার পিছনে যদি প্রতিবিম্ব প্রলেপ
না থাকে, তাহলে সেই আয়নার ভিতর দিয়ে
দেখতাম জ্যান্ত প্রণালী– গাছপালা!

তার নাম দিতাম জীবন্ত আয়না,
গাছের পাতার ভিতরেই যার জীবন ও মৃত্যুর
চিরন্তন হিসাব।

তুমি আয়না হও–
আমি তার ভিতর চোখ রেখে দেখবো
আর কতোদিন বাঁচি মায়ের বুকে!

প্রতারক পদচিহ্ন

প্রতারক পা খুঁজে বেড়ায় প্রতারক চোখ!
জলযান যেভাবে প্রতারণা করে মাছের সাথে,
মাছবিহীন বুড়িগঙ্গার জল বোঝে তার শূন্যতা।
পাখির সাথে শিকারির প্রতারণা–
শিকারিকে ঠকায় প্রতারক চক্র; শিকারের শিল্পিত ধূর্ততা
গাছ হয়ে শাখা মেলে পদচিহ্ন।
পুরুষ ঠকায় পুরুষ বিপরীতকে– ঠকবাজ!
নারী, প্রতারণার কারখানা নির্মাণ করে হাইহিলের সূচিশিল্পী
উত্তম পুরুষে; প্রতারক!

নারী-পুরুষের পা হেঁটে হেঁটে আঙুলগুলোকে রূপায়ণ করে,
খুঁজে ফেরে সাত সমুদ্দুর দূরের সুনীল চোখ–
চোখের ভিতরে চোখের রোমন্থন ঘটে
কাছে টানে, টান মেরে ফেলে দেয় ছিঁচকে অভিমান
বর্ণিত প্রতারকের কোলে।

প্রতারক পা এভাবেই আপন করে খোঁজে হন্তারক চোখ!

রেলরোডে উঁচু অন্ধকার

ঘুমিয়ে যাও গাছের পাতার মতো–
যার আশ্রয়ে আরাধনা করো,
... বিপুল অক্সিজেনের।
স্বপ্নগুলো উটপাখির ডিম– শক্ত হারকিউলিস,
অবুঝ পৃথিবীর মতো ঘুরে বেড়ায় মস্তিষ্কের চতুর্দিকে;
এই নক্ষত্র থেকে বহুদূর পড়শির বাড়ি পথে
দেখা হয়ে যায় আনাড়ি চিন্তার।

শ্যাওল পাঞ্জা হুক খুলে দেয় পটাপট আবৃত্তিতে,
কচি আদর আলাদা করে দেয়
শক্ত বাঁধন,
জিনিয়াস টি-শার্ট কাঁদছে মিঁউ মিঁউ
বাঁধন ভেঙে বিস্মিত উদ্বেগ হাসে মাধবকুণ্ডের জলপ্রপাত−
কুমারী মাটির বুকে জন্মায় ষোলচাষের কলাগাছ থান!

বিমূর্ত সংগীত থেকে উপলব্ধি করো জৈবিক অন্ন-অ্যাবসলিউট শৃঙ্গার-নুনের পায়েশ ।

গা লি ব র হ মা ন

বসন্তের রক্তিম ডানা

উবু হতে হতে আর কতটা মাটি ছোঁবো, পিতাজি!
আমি তো ঝরাপাতা নই− বসন্তের বৃন্তে বিভা ছড়িয়ে রক্তিম বিপ্লবী
তবু বলছো নত হও−
আমি ধর্ষিত হই কিংবা এই মৃত্তিকা−
তবে তোমার প্রত্যাশা নৈরাশ্যের ঘোলাজলে মিশে যাবে

এই বিপ্লব প্রজন্মের তাজা রক্তে−
বসন্তের বিভাগন্ধ ফেরি করে করে এই চত্বর এখন তরুণসমুদ্র

পিতাজি, তোমাকে প্রণাম করি
তবু আমাকে আবৃত হতে বলো না
বসন্তের রক্তিম ডানা মেলে তোমার প্রত্যাশার আকাশ পাড়ি দেবো

কারখানা

ইট বালু সিমেন্টের ভাঁজে ভাঁজে শ্রমবিক্রেতাদের শরীর। যাদের ঘাম শুষে নিয়ে ওরা পান করেছিল রঙিন শরাব। শুয়েছিল বাঈজির শুভ্র তাকিয়ায়। তবু নেশা হতে চাইছিল না বলে রক্তের স্বাদ নিয়েছে রান্নায়। গন্ধ আর তীব্র মাংসের ঝাঁঝে এবার ঠিক বুঁদ হবে ওরা। যেমন তাজরীনে পোড়া মাংসের গন্ধে নেশার দোলায় দুলেছিল।

ক্রমাগত শ্রমবিক্রেতারাই উৎকৃষ্ট মদ। কারখানাগুলো আরব্য সুরাহি।

এই পাত্রের পরতে পরতে কথারা আটকে আছে। সুখ দুঃখ আর স্বপ্নরা ফেরি হতো যে কথায়।

জা ন্না তু ল ফে র দৌ স

সাদা রঙের ভাঁজ করা ফেনা

একফালি চাঁদে কাদা মেখে
ছুটতে ছুটতে বহুদিন নিরুদ্দেশ।
চুন করা ঘরের রঙগুলোও
ততোদিনে মুষড়ে পড়েছে।

দু'পাশে ঊর্ধ্বশ্বাস
টেনে ধরে আছে পুরোটা শরীর
তলপেটে খামচে ধরে রক্তের টান
নাড়ির বাঁধন।

সফেদ প্রভাতের প্রেম
বাবলা গাছের দোলনাটার ঢেউ ফেলে
নিজেও কখন ডুব দিয়েছি; জানি না ।

একচিলতে শাড়ির আঁচল–
পড়ে আছে কলপাড়ের ড্রেনে,
তুলতে যাবো
সে নেশায় আজো বিনুনি খুলে বুঁদ হয়ে আছি ।

বাঁশপাতার নৌকাটা স্রোত খোঁজে
হেলে দুলে ডেকে বেড়ায় দুপুর অবধি
আর সাদা রঙের ভাঁজ করা ফেনা এসে
হাঁটুজলে বেড়ে ওঠে অবলীলায় ।

যুদ্ধ

এখন আর অশান্ত আকাশ ঝরে না চোখের পাতায়
কাঠপোকারাও গান করে না অভিরামপুর ব্রিজে
শুধু প্রতীক্ষা
অনন্ত দুপুর রাতভোর ।

শূন্য কোলে যুদ্ধাস্ত্র
যুদ্ধের স্বপ্ন দেখি প্রতিরাতে–
নদীর যুদ্ধ, পাখির যুদ্ধ, আকাশের যুদ্ধ
অঝোর বৃষ্টির যুদ্ধের মতো
ভরা নদীর তোলপাড়,
যুদ্ধ
যুদ্ধ শুরু হয়েছে
যুদ্ধ ।

সবুজ পাতার নূপুর

যখন ফের একা হব
মাঝনদীতে থেমে যাবে অষ্টমীর চাঁদ
ঝাপসা মেঘের ভাঁজে যদি পাই
ডমরুর জয়ধ্বনি ।

এখনও কিছু নই–জীবনযুদ্ধ স্রোতে;
সবই যে সমান্তরাল,
একমুঠো সন্ধ্যা এনে
বুকপকেটে বেঁধে রাখি যদি
রাতের স্নিগ্ধ বাতাসে হবে
ক্ষণিকের প্রণয় ।

আবার আমি দেখা দেব
ঘন কুয়াশার দেশে
সবুজ পাতার নূপুর যদি
যতনে পরায় এসে ।

শা মী ম হো সে ন

গোলাপ হাঁটছে

আমার সঙ্গে আজ গোলাপ হাঁটছে
চেয়ে দেখছে উদ্যানের সংগীতমুখর পথ
এই কুসুমিত সবুজ দুপুরময়–
ছড়িয়েছে তার পবিত্র সৌরভ...

বাঁশের সাঁকোটি যেমন বিশ্বাসে
দিনমান পার করে পায়ের আওয়াজ

যেভাবে নীরবে হেঁটে যায় ছায়া ও মানুষ
সেরকম নিঃশব্দে গোলাপ হাঁটছে...

মৃত প্রজাপতির মতো দেহটি তার এতদিন
হাঁটে নি পায়ে পরে ফুলের নূপুর–
অথচ আমার সঙ্গে আজ গোলাপ হাঁটছে
গোলাপ মানে বুকের ভেতর প্রেমের ভ্রূণ...

ছড়িয়েছি উড়কি ধান

আমার ভেতরে কেন? বাইরে এসো সোনাভান পাখি
রুপোর প্লেটে দেখো ছড়িয়েছি উড়কি ধান
পেট পুরে খেয়ে নাও– ঠোঁট ঘষে উড়ে যাও...
আমি তো প্রতিদিন বিনিদ্র রাত্রি জাগি ।

ডুমুরের গল্প না হয় শোনাবো একদিন
যেদিন বর্ষার জল ঝাপটা মেরে ভিজিয়ে দেবে
আমার এই পুরনো বাড়ির জানালার কাচ
তখন না হয় কিছু বলা যেতে পারে...

ভেতর থেকে বাইরে এসো সোনাভান পাখি
দেখো রুপোর প্লেটে ছড়িয়েছি উড়কি ধান...

জানি তুমি রাখবে এই কৃষ্ণ ঋষির সম্মান ।

ছায়াটি কোথায় গেল

আমাকে দাঁড়াতে বলে ছায়াটি কোথায় গেল
রোবটের স্নায়ু থেকে খুলে নিয়ে নাট
পাতার রেলগাড়িতে চেপে নিরুদ্দেশ হলো!
কতক্ষণ হলো হাতে ধরে আছি নিজেরই প্রাণ...

আমার অন্ধকার প্রিয় বোন এতক্ষণে আলো জ্বেলে

মাঝপথে এসে রাঙিয়েছে চোখ–
এই গভীর রাতে আর কত সময় দাঁড়াবো বলো?
ছায়াটির হাতে ঘড়ি থাকতেও নেই কি কাণ্ডজ্ঞান!

ঘন মেঘ কেটে গেলে পূর্ণিমা আলোয়
ছায়াটি এসে আমার পাশে দাঁড়ালো ।

হা স না ত শো য়ে ব

মাছঘরের বেদনা

অপরাহ্ন সমুদ্রের মাছঘরের বেদনা । নীল তিমি কিংবা শুশুকের সুস্বাদু মাংসল অনুভূতি । লিখে রাখি সময়ের শেষ প্রত্নলিপি । যেথা মাছ ডুবে ডুবে খণ্ডিত শীত আখ্যান রচিত । নিশ্চল হাতঘড়িতে লুকোনো নস্টালজিয়াও মুছে যাবে । ক্রমাগত ইনসোমনিয়ায় মুছে যেতে যেতে মাছঘর, মাংসল অনুভূতি ও হাতঘড়ি ভেসে ভেসে উঠে ।

কুরুশকাঁটায় আটকে আছে রাত

কুরুশকাঁটায় আটকে আছে রাত । মাংসের ভিতর আষাঢ় ডুবিয়ে রাখি । শরীরের সুঘ্রাণে তৈরি হয় যাবতীয় চিত্রকলা । ধীরে ধীরে হিমোগ্লোবিনও কমে যাবে । এখন কিছুটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত । জানালাগুলো দ্রুত বন্ধ করে দাও । বাঁ পাশের মানিপ্ল্যান্টও সরিয়ে দিও । ডিএনএ জুড়ে বেড়ে ওঠা জিরাফটা বড্ড দুষ্ট হয়ে আছে । তার বুকে একটু আদর ছোঁয়াও । ক্রমশ শুয়ে পড়ছি । আমার ভিতর তুমিও শুয়ে পড়ো ।

আপেলের জন্য যন্ত্রণা

পরমগীত; ইহা শলোমনের। তিনি নিজ মুখের চুম্বনে আমাকে চুম্বন করুন; কারণ তোমার প্রেম দ্রাক্ষারস হইতেও উত্তম। তোমার সুগন্ধি তৈল সৌরভে উৎকৃষ্ট; তোমার নাম সেচিত সুগন্ধি তৈলস্বরূপ; এই জন্যই কুমারীগণ তোমাকে প্রেম করে।
– ওল্ড টেস্টামেন্ট।

কুমারী মাতার গা বেয়ে সমুজ্জ্বল তারারা একে একে নেমে আসে
হ্রদে। স্বচ্ছ জলে পা ধুয়ে কুড়িয়ে নেয় স্থির আপেলের মাঠ।
আপেলের হৃদয় ভেদ করে দেয় আবাবিল পাখির দল। ঈশ্বর
পুত্রেরও বুক আছে। হৃদয়ভেদী আপেলের জন্য যন্ত্রণা আছে।
কাঠের বাক্সে ঘুমিয়ে থাকা আপেলের বুক দেখে কেটে যায় গোটা
সন্ধ্যাকাল। ঈশ্বর পুত্রের পায়ের ছাপে এঁকে দেই ক্রুশ। সেখানেই
ঘুমিয়ে পড়ি। অবিন্যস্ত ময়ূরের শব্দে ভোর আসে। পৃথিবীর
কোথাও কোনো রাত নেই।

নি র্ঝ র নৈঃ শ ব্দ্য

ঘৃতকুমারীর বন

পাল্টে যাওয়া রঙ আর ঘ্রাণের ভিতর সন্তরণ ভুলে যাই, ভুলে যাই
মাছ, জিরাফের পদচ্ছাপ, কাঁচা রক্তের অমিত আস্বাদ। তরল
অন্ধকারের ঘোর সহসা জ্বেলে দিলে অপরূপা বিদ্যুৎ– অনতিদূর
বনের ঝাড়ে জমাই নিশ্বাস। নিশ্বাস কোন মুদ্রার চক্রমিত রূপ–
জানে না একা ঘৃতকুমারীর বন। সেই বনে মুহূর্তেই অন্ধকারের গন্ধ
অবিনশ্বর হয়ে যায়। ভাঁজ খুলে ভাঁজ করি ছায়াচ্ছন্ন রতিদল।

নির্জন ঘুঘুস্বর

শাণিত বাতাস চিরে চলে রাত আর দিনের বিভেদ। আমি ফুল খুলে দেখি ছন্দময় সিঁড়িদল নেমে গেছে শীতের চিবুক থেকে চৈত্রের পাহাড়ে। পাহাড়ে শালবন আছে। শালবন অন্ধকারে কার চোখের মায়া দূর ভেঙে শুকনোপাতার রেকাবে জড়ায় নিশ্বাস! এই নিশ্বাস ঘন হলে জেনো ফিরে যাবে বটফল, রক্তিম শজারুদল। সেইসব রূপবতী শজারুর কাঁটাগুল্মে ডুবে গেলে কদুলির বন– নির্জন ঘুঘুস্বরে বাজে আরতি। পাশে বরফের দেশ আছে ভাঁজ করা রতি। রঙের ছায়া ছেনে ভবঘুরে লাল, ছায়ার গন্ধ এঁকে বিপন্ন তুলি। তারপর চোখ থেকে, আঙুল থেকে খুলে মুঠোভর্তি তন্দ্রা গুঁজে রাখি পাতার শিরায়। চোখ ঘষে দেখি পায়ের ভিতর উদ্গত আরো পদপাল। চোখ টেনে নিয়ে গেলো কবে মায়া-ল্যাবিরিন্থ! ধাঁধার পথের পিঠে উদ্ভিদগুলাব– আগুনের লোভে ছুটে গেছে।

কুয়াশা সুন্দর

একটু দাঁড়াও। কুয়াশাটা নামুক গাঢ় দেহে। কুয়াশার ভিতর হাঁটবো, হাঁটবো; এই দগ্ধ শহরের ধূলি ধূলি রাস্তায় হাঁটবো পরস্পর, আবেষ্টনে ভাঙবো দ্বিধা, চুমো খাবো পরপর, আলজির চুমো খাবো। আমাদের চুম্বনের টানে বহুদূর বনে ভেঙে পড়বে মৌচাক। কেউ জানবে না মধুক্ষরা সন্ধ্যার বন কেমন, কেউ জানবে না এইসব সুন্দর– কুয়াশার দেয়াল আমাদের রাখবে ঘিরে– কবেকার পুলিশের মতো দেবে পাহারা!

কাকমারা

....

শ ও ক ত হো সে ন

একহাতে ষাঁড়ের রশি। অন্য হাতে শক্ত করে ধরা ছয় বছরের ছেলে আনুর কব্জি। অশান্ত ষাঁড়। শিং দিয়ে মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তে দৌড়োচ্ছে ! ছড়-ছড় করে আবদেলকে নিয়ে যাচ্ছে টেনে-হিঁচড়ে। আচমকা হাতের মুঠি থেকে ছেড়ে দিতে হয় এতটুকু ছেলের হাত। চোখের পানিতে একাকার, চিৎকার করে কাঁদতে থাকে আনু। লালষাঁড় ছুটছে তো ছুটছেই, কী করবে আবদেল! মুঠ থেকে ছাড়বে ষাঁড়ের রশি নাকি আনুকে? ষাঁড়ের রশি ছেড়ে দিলে অন্যের ফসল মাড়াবে– ! এতটুকু ছেলের জন্যও ভয়। টানতে-টানতে এক্কেবারে নদীর ধারে নিয়ে গেল! একটি জিগা গাছে দ্রুত বেঁধে ফ্যালে। হতচকিত তাকিয়ে ছেলেকে আর দেখে না–! গেল কই? যেখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। বিন্যাছোবার কাছে দৌড়ে গিয়ে পাগলের মতো করছে আবদেল। যতদূর চোখ যায় কোথাও আনু নেই–! তাহলে কি পাশের খালে পড়ে গেল! হন্তদন্ত পাটখড়ির বেড়া-ঘেরা পাশের বাড়িতে ঢুকেও খোঁজ মিলল না। ক্ষিপ্র আবদেল নদীর ধারে অসহায়– রাগে-দুঃখে জিগা গাছের ডাল ভেঙে ষাঁড়কে ভীষণ পেটায়। পেটাতে-পেটাতে চড়াদাগ হয়ে গেছে দেখে হাউ-মাউ আবার কাঁদে। গামছায় চোখ মুছতে-মুছতে মাথা তুলে তাকাতেই দেখে, দুই হাতে দুটি কচুরিফুল নিয়ে আনু ছোট্ট কদমে গাঙপাড়ের দিকে আসছে। আবদেল এক দৌড়ে গিয়ে কোলে তুলে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে।

– কাপলা গাছের ছ্যামায় ইট্টু খাড়া বাপ। আবালডারে নাওয়াইয়া তরে নাওয়াইয়া দিমু।

(যেন কিচ্ছুটি ঘটে নাই। কচুরিফুল বাপের গালে ছোঁয়ায় আনু)।

ষাঁড় আর আনু'র গোসল দিয়ে নিজের গোসল সারে আবদেল। গাঙপাড় থেকে বাড়ির দিকে রওনা দেয়। ষাঁড় শান্ত– মানুষের সমান তালে কদম ফ্যালে।

– (বাড়ির কাছে গিয়ে,) বউ... বউ... ভাত বার, খিদা লাগছে।

– আইচ্ছা, আহেন, বারতাছি।

ছোট্ট বেলেমাছের চচ্চরি আর ধনেপাতা ভর্তা দিয়ে পেট পুরে ভাত খায় আবদেল। বাবার সঙ্গে আনুও। বউ জমিলা গোসলে যাই-যাই করছে অনেকক্ষণ। ক্ষুধা পেয়েছে বড়। গোসল সেরে এসে ভাত খাবে। এই ফাঁকে আবদেল বিছানায় শরীরটা ছেড়ে দেয়– ঘুমের কাছে সঁপে দিয়ে ইহজগৎ ছাড়ে। ঘুম এভাবে মানুষকে গ্রাস করে! কয়েক দিন ধরেই আবদেলকে বড় ক্ষিপ্র দেখাচ্ছে। নিস্তেজ বাবার গায়ে এখন এক-পা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে খেলা করছে আনু। আনু যে এত নড়াচড়া করছে লাথি-গুঁতো দিচ্ছে, তাতেও ঘুম ভাঙছে না আবদেলের। জমিলা এখনো গাঙপাড় থেকে ফেরেনি।

হঠাৎ ঘুম ভাঙে আবদেলের। জমিলা এখনো ফেরেনি! বাড়ির বাইরে গিয়ে গাঙের দিকে তাকিয়ে আবদেল জমিলার কোনো হদিস পেল না। ধীর কদমে এগিয়ে যায় গাঙের দিকে। গাঙপাড়েও জমিলাকে না-পেয়ে– আবদেল আরও চিন্তিত হয়ে পড়ে। বাড়িতে আনুকে রেখে এসেছে, জমিলা যে কই গেল! আবদেলের চোখে পড়ে, জিগা গাছের ডালে জমিলার শাড়ি-ব্লাউজ ঝুলছে– কাপড়-চোপড় রেখে কই গেল! পাশ দিয়ে দ্রুত হেঁটে যায় পাশের গ্রামের রহিমন। সে-ও খোঁজ দিতে পারে না জমিলার। তাহলে গেল কই? – তাহলে কি কুমিরে! ... জমিলার কি কোনো ক্ষতি হল ...!

গাঙের ওই পারে তাকিয়ে আবদেল আচমকা দেখতে পায় জমিলা সাঁতরিয়ে এই পারে আসছে। বউয়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে– জমিলা স্রোতের তোড় ভেঙে অজানা উচ্ছলতায় এপারে এসে গলা-পানিতে দাঁড়ায়। আবদেলের রাগত মুখ হালকা করার জন্য একটা হাসি খেলে যায় জমিলার শ্যামলা জলোজ মুখে। আবদেলেরও মুচকি হাসি বাঁধ ভাঙে...। জমিলার গোসল শেষ হলে দু'জনে বাড়ির দিকে রওনা দেয়। বাড়িতে আনু একা, চিন্তা বাড়ে দু'জনের। শুকনা কাপড় হাতে ভেজা শরীরে হন্তদন্ত পা বাড়ায় জমিলা। জেগে ওঠা ধারালো বৃন্ত কাপড়ে সামলাতে আরেকবার পরামর্শ দেয় আবদেল।

– (বাড়ির কাছে গিয়ে,) তুই যা, বাড়িতে গিয়া ভিজা কাপড় বদলা– ভাত খা গিয়া–। আমি আইতাছি।

আবদেল গেল বাড়ির পাছে, ছোট্ট একচিলতে জমিতে, কয়েকদিন আগে আলু লাগিয়েছিল সেগুলো দেখতে– সেই আলু থেকে অঙ্কুরোদগম হয়ে মাথা দিয়ে মাটি ঠেলছে পত্র–। আবদেলের খুশি মনে ধরে না! অনেকক্ষণ একাই মিটমিট হাসে। এতক্ষণ হাঁটু গেড়ে বসেছিল। বসা থেকে দাঁড়াল, এবার বাড়ির দিকে–।

বাড়িতে শেষবেলায় ক্ষুধার্ত পেটে ভাত খেতে বসেছে জমিলা। ছেলে আনু অঘোর ঘুমে। ঘরের পাছে বাঁশঝাড়ে হঠাৎ বিকট শব্দ! কীসের! কোনো গুলির! আনুর আচমকা ঘুম ভাঙে। জমিলা কেঁপে ওঠে–, ঘরের বাইরে এসে দেখে, কেউ নেই। আবদেল দৌড়ে আসে ক্ষেত থেকে। একদৌড়ে ঘরের পাছে যায়। কাউকে দেখতে পায় না। আরেকটু এগিয়ে

বাঁশঝাড়ের মধ্যে দ্যাখে, একটা কাক মরে পড়ে আছে। এদিক-ওদিক তাকায়। কোথাও কেউ নেই! কিছু পরে বাঁশঝাড়ের নীরবতা ভেঙে ওপাশ থেকে একটা হাসির শব্দ, ক্রমে কাছে আসে। হাসি আরও চাক্ষুস হতে থাকে। আবদেল বুঝে ওঠে, বাঁশঝাড়ে বন্দুক হাতে চেয়ারম্যান আবু মুন্সি।

বছর বিশেক আগে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হয়েছিল– তখন একটা বন্দুক কিনেছিল। সেই বন্দুকই অতি যত্নে এখনো ব্যবহার করে। বর্ষার পানি টান দিলে বক নামে কাদায়, মাছ খেতে। উদর পুরে গেলে বাঁশঝাড়ে এসে বিশ্রাম নেয়। মুন্সি তখন বক মারতে আসে।

– কী মিয়া কেমন আছ?

– আছি, চেয়ারম্যান সাব, আফনাদের দোয়ায়।

– তোমার ছেলেটার নাকি অসুখ, সতীশ বলল, ছেলের এহন কী অবস্থা?

– এহন ভালো। (মাথা নিচু করে রাখে আবদেল কিন্তু শরীরটা ওর খাড়া)

– তুমি ভালো আছ তো?

– হ। (একটু থেমে) তয় হুনছি ঢাহায় নাহি বিচার-আচার শুরু হইছে?

– হুনবা কেন, টেলিভিশনে তো মাঝে-মদ্দেই দেখায়। (আবদেল মাথা একবার উঁচু করে আবার মুহূর্তে নিচু করে ফ্যালে) বুচ্ছি, তোমরা আমারে নিয়া চিন্তায় আছ, হোনো আমারে নিয়া কোনো চিন্তা কইরো না। বিচার-আচার গ্রামে-গঞ্জে আইব না!

– হুনছি ঢাহার শাহাবাগে না কই জানি ফাঁসির দাবিতে লক্ষ মানুষ জড়ো হইছে?

– হউক গিয়া! হোনো মিয়া, ঐ সবে কান দিও না। আর এতো খবর রাখতে যাও কেন? দিনকাল ভালো না– ! এতো খবর দিয়া কাম কী!

(একটু হাসি দিয়ে, দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে-ছাড়তে) দেহো কী কাণ্ড , মারতে চাইলাম বক, মইরা গেল কাউয়া!–
যাও-যাও কাউয়াডারে নিয়া একটু কবর দিয়া দাও। বোবা ধন, অর-ও-তো একটা জান!
আমি যাই... (আরেকবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে-ছাড়তে)
ডানহাতে কাকের একটি পাখনা ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আবদেল। অনেক বছর হয়, গ্রামের বাড়ি ছেড়ে আবু চেয়ারম্যান নদীর ওপাড়ে চরমুগুরিয়ায় থাকে।

পেছন থেকে আবদেল মুন্সির চলে যাওয়া দেখে। তার ভয় পাওয়া দেখে...

কখন জানি, আবদেলের হাত থেকে মরাকাক পড়ে যায়। ছোটবেলায় বাপহারা হয়েছে তো!... ...পুরনো সেই আগুন জ্বলে ওঠে!

কয়েক দিন ধরেই ঢাকার শাহবাগে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সংসারের অভাব-অনটন আর ব্যস্ততায় যেতে পারছিল না। মনটা বড় অস্থির হয়ে ছিল! কাকমারা গুলির শব্দ চেপে-রাখা আগুনে বারুদ গর্জনে জ্বলে ওঠে! মুন্সিকে হাতের নাগালে পেয়ে মুহূর্তে ঠিক হয়ে যায় নিশানা; শাহবাগে যাওনের অতো সময় নাই! পাগলা একটা অগ্নিকুণ্ড নদীর দিকে তীরবেগে ছোটে!

কিছুবাদে ঠা-ঠা আরও দুইটা গুলির শব্দে– বাতাসে বারুদের গন্ধ মিশে যায়, কুমার জলে বহু রেখায় ভাগ হয়ে যায় বদ রক্তের লাল...

কিছুবাদেই ঘর্মাক্ত শরীরে বাড়ি ফেরে আবদেল। মরাকাক কবরস্থ করে। বাবার কথা মনে পড়ে... খুব... আবদেলের চোখভরে শান্তিতে অশ্রু নামে...

ক্ল্যা সি ক/ প্র ব ন্ধ

হোমার ও ইলিয়াড

....

মা স রু র আ রে ফি ন

হোমারের জন্যপ্রশস্তিগাথা

যে সাহিত্যকে আমরা ‘পশ্চিমা’ সাহিত্য বলে জানি, তার শুরু এক দীর্ঘ কবিতার মধ্য দিয়ে। সেই কবিতায় এখনকার গ্রিস নামের দেশ থেকে আসা যোদ্ধা বীরেরা বর্তমান তুরস্কের পশ্চিম উপকূলে ট্রয় নামের প্রাচীনকালের এক বিখ্যাত শহর দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ করে

রেখেছিল। অবশ্য খ্রিস্টপূর্ব সেই বারোশ শতকে— যখন ঘটে এই অবরোধের ঘটনা— 'পশ্চিম' বা 'পুব'-এর সংস্কৃতি বলতে কোনো আলাদা ধারণারই জন্ম হয়নি, তেমনই 'গ্রিস', 'তুরস্ক' এসব জাতি-রাষ্ট্রের নামেরও কোনো অস্তিত্ব ছিল না। *ইলিয়াড* যখন গাথা হয়— প্রাচীন গ্রিক ইতিহাসের খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ থেকে ৫৬৬ সালের মধ্যে কোনো এক সময়ে— তখন ভূমধ্যসাগরের পুব ও পশ্চিমের জাতিগুলোর মধ্যে সাংস্কৃতিক বিভাজনকেন্দ্রিক কোনো চেতনারই সূচনা ঘটেনি। ভূমধ্যসাগরের ডানে ও বাঁয়ে তখন মানুষ, গল্পকাহিনী, সংগীত, বাণিজ্যিক পণ্য, ছবি আঁকার প্রকরণ— এ সবই পাশবদল করছে সহজে, এর সঙ্গে ও গিয়ে মিশে যাচ্ছে অবারিতভাবেই। এরই মধ্যে একদিন দক্ষিণ থেকে গ্রিকরা এসে হাজির হল ভূমধ্যসাগরের পুব দিকে, ইলিয়াম (ট্রয়ের প্রাচীন নাম) নামের বিখ্যাত নগরটির কাছের সমুদ্র উপকূলে। সৃষ্টি হল 'ইলিয়ামকে নিয়ে গান' বা *ইলিয়াড* শীর্ষক এক গীতিকাহিনীর— বেদনাদীর্ণ, জীবন্ত আর সোজাসাপটা বলা এক ট্র্যাজিক আখ্যানের। আজও *ইলিয়াড*, তিন হাজার বছর পরেও, জ্বলজ্বল করছে সর্বকালের সবচেয়ে প্রভাবশালী সাহিত্যকর্মের তালিকার একদম ওপরের দিকে, প্রায়শই প্রথম স্থানে।

ইলিয়াড-এর এই সাফল্য আসলেই বিস্ময়কর, কারণ এই দীর্ঘ কবিতা (যাকে বলা হয় এপিক বা মহাকাব্য) না পাঠ করা সহজ, না এর কাহিনী কোনো মজাদার কিছু। প্রাচীনকালেও শ্রোতাদের সংগ্রাম করতে হত স্রেফ এর ভাষা বুঝতে গিয়ে, আর দীর্ঘ পাঠসন্ধ্যার মাঝখানেই ঘুমিয়ে পড়ত অনেকে। কিন্তু *ইলিয়াড*-এর শব্দচয়ন ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কিত 'সমস্যা' তারপরও অকিঞ্চিৎকর থেকে গেছে আমাদের হৃদয় ও মনে, এই কাহিনী ও এর বুনন যে ঝংকার তোলে, তার সাপেক্ষে। এই মহাকাব্য কোনো প্রাক্‌কথন, কোনো ভান-ভনিতা ছাড়াই আমাদের— এক ক্ষমাহীন স্বচ্ছতায়— ধুম করে দাঁড় করিয়ে দেয় এমন সব বিষয়ের মুখোমুখি যেগুলো আমরা বরং ভুলে থাকতে পারলেই খুশি হতাম: নেতৃত্বের ব্যর্থতা, সৌন্দর্যের বিধ্বংসী শক্তি, যুদ্ধের নির্মম-নৃশংস চেহারা, মানুষের 'সর্বসেরা' হওয়ার প্রতিযোগিতা— এবং সর্বোপরি— মৃত্যু নামের আমাদের চূড়ান্ত পরিণতি। *ইলিয়াড* যে আজও এত বিশাল জনপ্রিয় (নব্বইয়ের দশকে প্রকাশিত রবার্ট ফ্যাগলস্-এর ইংরেজি *ইলিয়াড* বিক্রি হয়েছিল ৩ মিলিয়ন কপি; আর শুধু ইংরেজিতেই *ইলিয়াড*-এর অনুবাদ আছে প্রায় ৩১৫টি) এক সাহিত্যকর্ম, সেটাই সাক্ষ্য দেয় এর অসীম শক্তির।

ইলিয়াড ইউরোপিয়ান সাহিত্যের শুধুমাত্র প্রথম কীর্তিই নয়, এর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিরও যোগ্য দাবিদার।[১] *ইলিয়াড*-এর প্রভাব শুধুমাত্র পরবর্তীকালের গ্রিক সাহিত্য, চিন্তা, শিল্পকলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সেইসঙ্গে যা কিছু ইউরোপিয়ান ঐতিহ্যের কেন্দ্রীয় বিষয়, তার সবকিছুতেই গিয়ে পড়েছে— এতটাই যে, *ইলিয়াড*কে যুক্তিসঙ্গতভাবেই বলা যায় পুরো পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তর।[২]

একইরকম কথা বলেন হ্যারল্ড ব্লুম, যিনি বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে খ্যাতিমান সাহিত্য বিশ্লেষক ও বোদ্ধাদের প্রথম কাতারের একজন। ব্লুম বলেন: 'বাইবেল ও *ইলিয়াড*-এর মধ্যেই আছে পশ্চিমা সাহিত্য, চিন্তা ও আধ্যাত্মিকতার— আরও বৃহৎ অর্থে বললে পুরো

পশ্চিমা সংস্কৃতিরই— ভিত্তি'।[৩] সেইসঙ্গে *ইলিয়াড*-এর প্রধান চরিত্র অ্যাকিলিস সম্বন্ধে ব্লুমের মন্তব্য: 'আর কোনো পুরোপুরি সাহিত্যিক চরিত্রই এতখানি বীরত্বব্যঞ্জক নয়, নান্দনিক বিচারে অ্যাকিলিসের মতো এতটা সন্তোষজনক নয়।'[৪]

আলবার্তো ম্যাঙ্গুয়েল, যিনি সবসময়েই কোনোকিছু মজা করে লিখতে সিদ্ধহস্ত, খুশি যে, 'যে দুটো বই (হোমারের *ইলিয়াড* ও *অডিসি*) অন্য যে কোনো বইয়ের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে পশ্চিমা বিশ্বের মানুষদের কল্পনা-ক্ষুধা মিটিয়ে গেছে আজ আড়াই হাজার বছর যাবত, সে দুই বইয়ের যে কোনো স্পষ্ট শুরুর ইতিহাস ও কোনো পরিষ্কার স্রষ্টা থাকবে না, তা-ই তো স্বাভাবিক'।[৫]

এখানেই ম্যাঙ্গুয়েল উসকে দিয়েছেন *ইলিয়াড*-এর স্রষ্টা ও এর রচনার ইতিহাস সম্পর্কিত বিরাট প্রশ্নটিকে, যার নাম 'Homeric Questions': ট্রোজান যুদ্ধ আসলেই কি ঘটেছিল, হোমার নামের কেউ কি সত্যিই এ দুই মহাকাব্যের স্রষ্টা? ইত্যাদি। হোমারের আগেও যে হোমার ছিলেন, সেসব প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব এই 'ভূমিকা' অংশেই। এখানে শুধু খ্যাতিমান ফরাসি ঔপন্যাসিক, কবি রেঁম কুইনোর (Raymond Queneau; ১৯০৩-১৯৭৬) এক বিখ্যাত উক্তির উল্লেখ করছি, যা আলবার্তো ম্যাঙ্গুয়েল ব্যবহার করেছেন তার বইটির একদম শুরুতে। গুস্তাভ ফ্লবেয়ারের মৃত্যু-উত্তর প্রকাশিত ব্যঙ্গধর্মী অসম্পূর্ণ উপন্যাস *Bouvard et Pecuchet*-এর ('বুভা এ পেকুশে', ১৮৮১) মুখবন্ধে কুইনো লিখেছিলেন: 'যে কোনো মহান সাহিত্যকর্মই হয় *ইলিয়াড*, না হয় *অডিসি*।'[৬] কুইনো-র ভাষ্য ছিল অনেকটা এরকম: *ইলিয়াড*-এর কেন্দ্রে আছে মানুষের নশ্বরতার বোধ এবং মানবজীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা, রক্তপাত ও যুদ্ধ; আর *অডিসি*র কেন্দ্রে মানুষের ঘরে ফেরার আকাঙ্ক্ষা। একটির মূল কথা 'জীবন এক যুদ্ধের নাম', আরেকটির 'জীবন এক সফরের নাম'। আর এ দুটি বিষয়ই যেহেতু মানবজীবনের সবচেয়ে আদি ও অকৃত্রিম দুই মেটাফর (রূপক অর্থে), তাই আশ্চর্য কী যে, যে কোনো ভালো সাহিত্যকর্মই হয় হবে *ইলিয়াড*, না হয় *অডিসি*?

এরপরেই আলবার্তো ম্যাঙ্গুয়েল দাবি করে বসলেন, পৃথিবীর খ্যাতিমান বা ভালো প্রত্যেক লেখকই *ইলিয়াড* এবং *অডিসি* দিয়ে অনুপ্রাণিত; অন্য কথায়: '*ইলিয়াড* ও *অডিসি* পড়া ব্যতীত কেউ ভালো লেখক, কবি হতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয়।' ম্যাঙ্গুয়েলের কথাটির মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে অবশ্যই, কারণ এ-কথা বলার সময়ে পৃথিবী বা বিশ্বসাহিত্য তার কাছে যতটা বড় বলে মনে হয়েছিল, তার থেকে বাস্তবে তা আরও অনেক বেশি বড় বটে। কিন্তু এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যুগে যুগে *ইলিয়াড* প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করে গেছে বিশ্বসাহিত্যের সেরা সব লেখক-কবিকে। আগেই বলেছি, *ইলিয়াড*-এর ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে এ-পর্যন্ত প্রায় ৩১৫টি, যার শুরু সেই ১৫৯৮ সালে, জর্জ চ্যাপম্যানের হাতে। চ্যাপম্যানের *ইলিয়াড* নিয়েই পরে ১৮১৭ সালে কবি জন কিটস্ (১৭৯৫-১৮২১) লিখলেন তার অমর কবিতা 'On First Looking into Chapman's Homer', যার প্রথম চার পঙ্ক্তি আমাদের অনেকেরই মুখস্থ হয়ে আছে:

‘Much have I travell’d in the realms of gold,
And many goodly states & kingdoms seen:
Round many western islands have I been
Which bards in fealty to Apollo hold.’

আর এর পরের বছরেই আরেক বিখ্যাত ইংরেজ কবি শেলি (১৭৯২-১৮২২) অনুবাদ করলেন *Homeric Hymns (‘হোমেরিক স্তোত্রগীত’)*। এর একশ বছর আগে আলেকজান্ডার পোপ ইংরেজিতে *ইলিয়াড* (১৭১৫) ও *অডিসি*-র (১৭২৬) অনুবাদ করে তো ইংরেজি কবিতার মোড়ই ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, এতটাই যে, আজও শ্রেষ্ঠতম ইংরেজি কবিতার যে কোনো সংকলনে দেখা মেলে বিশেষত পোপের *ইলিয়াড*-এর অনবদ্য কিছু অংশের।

কে হাত দেয়নি *ইলিয়াডে?* শেকস্‌পিয়ারের *ট্রয়লাস ও ক্রেসিডা* নাটকটি *ইলিয়াড*-এর কিছু চরিত্রেরই ছায়ায় গড়া। গবেষকেরা বলেন, তিনি লাতিনে ওভিদ পাঠ করে *ইলিয়াড*-এর কথা জেনেছিলেন, কিংবা তিনি চ্যাপম্যানের *ইলিয়াড* পড়েছিলেন। তার *ট্রয়লাস ও ক্রেসিডা*-র সৃষ্টি হয় ১৬০২ সালে, অর্থাৎ চ্যাপম্যানের *ইলিয়াড* প্রকাশের চার বছর পরে। কবি জন ড্রাইডেন (১৬৩১-১৭০০) তো *ইলিয়াড*-এর বেশ কয়েকটি পর্বের জনপ্রিয় অনুবাদই বের করেছিলেন মৃত্যুর কিছুদিন আগে। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিখ্যাত কবি, লেখকদের মধ্যে *ইলিয়াড* ও *অডিসি* নিয়ে কাজ করেছেন এমন আরও কিছু উজ্জ্বল তারকার নাম: দার্শনিক টমাস হবস্ (*ট্রাভেলস্ অব ইউলিসিস*, ১৬৭৩; এবং পরে ‘হোমার সমগ্র’); উইলিয়াম কুপার (১৭৩১-১৮০০; যিনি আলেকজান্ডার পোপের অপার সৃজনশীল *ইলিয়াড*-এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন: ‘I have omitted nothing; I have invented nothing’—যে উক্তি আজও উচ্চারিত হয় সাহিত্যে ‘অনুবাদ’ বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায়); চার্লস ল্যাম্ব (১৭৭৫-১৮৩৪; *অডিসি*-র সংক্ষেপিত অনুবাদ); আলফ্রেড লর্ড টেনিসন (১৮০৯-১৮৯২; যাঁর *The Lotos-Eaters* Ges *Ulysses* আমাদের সাহিত্য পাঠে হোমার-অভিজ্ঞতার শীর্ষবিন্দুর কাছাকাছি অবস্থান করছে আজও); ম্যাথু আরনল্ড (১৮২২-১৮৮৮; নিজেও হোমার অনুবাদক এবং একইসঙ্গে হোমার অনুবাদ বিষয়ক সবচেয়ে বিখ্যাত বিধিমালার প্রবক্তা); রবার্ট ব্রাউনিং (১৮১২-১৮৮৯); স্যামুয়েল বাটলার (১৮৩৫-১৯০২); এজরা পাউন্ড (১৮৮৫-১৯৭২); ডি. এইচ. লরেন্স (১৮৮৫-১৯৩০); টি. ই. শ বা ‘লরেন্স অব অ্যারাবিয়া’ (১৮৮৮-১৯৩৫; যাঁর অনুবাদে *অডিসি* আজও পাঠকের হাতে হাতে ঘোরে); ডব্লু. এইচ. অডেন (১৯০৭-১৯৭৩; যাঁর ১৯৫২ সনে লেখা কবিতা ‘The Shield of Achilles’ আজও মহত্তম ইংরেজি কবিতারই একটি); এবং রবার্ট গ্রেভস্ (১৮৯৫-১৯৮৬; যাঁর *ইলিয়াড* অনেক খ্যাতি অর্জন করে প্রথমবারের মতো এই মহাকাব্যের সার্বিক আনন্দের দিকটিতে জোর দেবার জন্য)।

এ-তো গেল নামকরা ইংরেজি ভাষার ক্লাসিক্যাল যুগপর্বের কবি-লেখকদের তালিকা, যারা হোমার নিয়ে কাজ করেছেন, হোমারে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এই নামগুলোরই একদম উপরের দিকে বসবে আরও দুটি নাম— একটি জেমস্ জয়েসের, অন্যটি ডেরেক ওয়ালকটের। জয়েসের উপন্যাস *ইউলিসিস* (১৯২২) স্বীকৃত হয়ে আছে বিংশ শতাব্দীর

বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস হিসেবে। তাঁর এই *ইউলিসিস*-এর সর্বত্রই— প্রায় প্রতিটি পাতাতেই, প্রতিটি অধ্যায়ের নামেই— আছেন হোমার। প্রসঙ্গত, ইউলিসিস হোমারের *ইলিয়াড*-এর অন্যতম নায়ক, এবং *অডিসি*-র প্রধান নায়ক বীর অডিসিয়ুসেরই লাতিন নাম। আর ডেরেক ওয়ালকট ১৯৯০ সালে প্রকাশ করলেন তাঁর আধুনিক মহাকাব্য *ওমেরস* (যা হোমারের গ্রিক নাম; গ্রিকরা হোমারকে বানান করে Homeros, আর উচ্চারণ করে ওমেরস)। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে লেখা ওয়ালকটের এই অ্যাকিলিস-হেক্টর-হেলেনের উত্তরাধুনিক মহাকাব্য তাঁকে দুবছর পরে, ১৯৯২ সালে, এনে দিল সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার।

এর বাইরে বিশ শতকের অন্যতম প্রধান গ্রিক ঔপন্যাসিক, *জোরবা দি গ্রিক*-এর লেখক নিকোস কাজানৎজাকিস ১৯৩৮ সালে প্রকাশ করলেন তাঁর সুদীর্ঘ মহাকাব্য, দৈর্ঘ্যে যা হোমারের *অডিসির* প্রায় তিনগুণ, *'দি অডিসি— এ মডার্ন সিক্যুয়েল'*। বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম সেরা কীর্তিটি নতুন যুগে, নতুনভাবে সামনে এল পাঠকের, হোমারেরই স্বদেশি আরেক গ্রিকের হাত ধরে।

আধুনিক কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে হোমার বিষয়ক বা হোমারে অনুপ্রাণিত লেখা লিখেছেন আরও অনেকেই (নামগুলো এখানে দেওয়া হল কোনো জন্মসাল বা বড়-ছোট ইত্যাদি ধারাক্রম না মেনে): যেমন গ্রিক কবি সি. পি. কাভাফি (তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতাটির নাম 'ইথাকা', যার পেছনে আছে অডিসিয়ুসের ঘরে ফেরার সংগ্রামমুখর বিষয়টি); ফরাসি লেখিকা মারগারেট ইয়োরসেনার; ভার্জিনিয়া উলফ (তাঁর ১৯২০ সালের প্রবন্ধ 'The Intellectual Status of Women' *অডিসি*-র স্রষ্টা যে হোমার নন বরং কোনো নারী কবি, এই বিতর্ককে নতুন করে উসকে দেয়); এইচ. জি. ওয়েলস; ইতালো কালভিনো; এমিলি জোলা; জর্জ বার্নার্ড শ; ওয়ালেস স্টিভেনস; মিগেল দি উনামুনো; মারিও বার্গাস ঝোসা; হোরহে লুইস বোরহেস (যাঁর গল্প 'The Immortal'-এর মূল নায়ক হোমার নিজে); এডগার অ্যালান পো; ফ্রানৎস কাফকা (যাঁর একটি বিখ্যাত অণুগল্প আছে 'The Silence of the Sirens' নামে; সাইরেনরা হোমারের *অডিসি*-র জলপরী); লিও টলস্টয়; গেয়র্গ লুকাচ (তাঁর প্রবন্ধ 'To Narrate or Describe?' হোমার বিষয়ে আগ্রহীদের জন্য অবশ্যপাঠ্য); রুডইয়ার্ড কিপলিং; ইসমাইল কাদারে; আন্দ্রে মালরো; ভ্লাদিমির নবোকভ; ফ্রেডেরিখ নিট্শে; মার্গারেট অ্যাটউড (*পেনোলপিয়াড*-এর লেখিকা, যাঁর পেনেলোপি আমাদেরকে স্বামী অডিসিয়ুসের বিশ বছর ধরে ঘরে না থাকার ভাষ্য শোনায় স্ত্রীর জবানিতে); আলেসান্দ্রো বারিক্কো (*সিল্ক* উপন্যাসের বিখ্যাত এ-লেখক নতুন করে লেখেন *ইলিয়াড*, কাহিনীটি এর চরিত্রগুলোর ভাষ্য দিয়ে ঢেলে সাজিয়ে, ২০০৪ সালে); জাঁ জিরাদু; গ্যেয়টে; ডরিস লেসিং; জোসেফ ব্রডস্কি; পল ভেরলেইন প্রমুখ। স্থানের অভাবে যেহেতু এই লেখক-কবি-দার্শনিকদের হোমার বিষয়ক লেখালেখি-গবেষণা-উক্তিগুলোর এখানে কোনো বিবরণ দেওয়া হচ্ছে না, তাই এ-তালিকা দীর্ঘ করারও আর প্রয়োজন দেখি না। এই তালিকায় গ্যেয়টে থেকে শুরু করে জর্জ বার্নার্ড শ, বোরহেস থেকে নিয়ে গেয়র্গ লুকাচ— এঁদের সবার উপস্থিতি কিছুটা হলেও সাক্ষ্য দেয় যে আলবার্তো ম্যাঙ্গুয়েলের দাবিটির মধ্যে

(*ইলিয়াড* ও *অডিসি* না পড়ে কেউ ভালো লেখক, কবি হতে পারেননি) সামান্য হলেও সত্যতা আছে। মাত্র চব্বিশ-পঁচিশজনের নাম এখানে তুলে ধরলাম আমি, ম্যাঙ্গুয়েলের দেওয়া একশ-র অধিক নামের বিপরীতে।

এ-তো গেল আধুনিকদের কথা। প্রাচীনকালের দিকে যদি তাকান, তবে দেখবেন হোমার প্রসঙ্গে কথা বলেছেন হেরোডোটাস থেকে শুরু করে সাধু লন্‌জাইনেস (Longinus) পর্যন্ত বিদগ্ধ, বিখ্যাত সবাই। প্লেটো বলেছিলেন: 'হোমার অ্যাকিলিসকে চেয়েছিলেন ট্রয়ে আসা মানুষগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সাহসী করে দেখাতে, আর নেস্টরকে সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান এবং অডিসিয়ুসকে সবচেয়ে ধূর্তবুদ্ধির'।[৭] প্লেটো অবশ্য তাঁর *রিপাবলিক* গ্রন্থে সাহিত্য বিষয়টিকে (আর প্লেটোর কাছে হোমারই ছিলেন শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতিভূ) গালমন্দ করেছেন যেহেতু তা 'অন্যের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে বেশি ভাবাভাবি করে,' এবং প্রশংসা করে ও দয়া দেখায় এমন কাউকে যে কিনা 'নিজেকে দাবি করে ভালো মানুষ হিসেবে, কিন্তু আবার দুঃখশোক প্রকাশের বেলায় নিজেকে ছেড়ে দেয় বাড়াবাড়ির হাতে।' প্লেটো বলেন, 'আমাদের ভেতরকার এই দিকটাই কবিরা তৃপ্ত করে, এটার চর্চাতেই কবিদের আনন্দ,' এবং একে এড়ানোর স্বার্থেই আমাদের উচিত 'কবিতাকে পুরোপুরি ঘৃণা করা'। এই প্লেটোই আবার হোমারকে পছন্দ করতেন বললে কম বলা হবে, তিনি রীতিমতো পুজো করতেন হোমারের। প্লেটোর সংলাপে (Dialogue) মোট ৩৩১ বার রেফারেন্স আছে হোমার ও তাঁর দুই মহাকাব্যের। এরই একটিতে আমরা দেখি এক শিষ্য সক্রেটিসকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'সক্রেটিস, আপনি নিজে কি কবিতার জাদুকে অনুভব করেন না, বিশেষ করে যদি হোমার হন কাব্যদেবীর বাহন?' সক্রেটিসের উত্তর: 'বিরাটভাবে করি।' প্লেটোর সংলাপের মধ্যেই আছে হোমারকে নিয়ে এ-যাবতকালের সবচেয়ে বড় প্রশস্তিসূচক বাক্যটি। প্লেটোর ভাষ্যমতে কথাটা বলেছিলেন সক্রেটিস; তিনি বলেছিলেন, হোমার হচ্ছেন, 'সবার থেকে সেরা এবং সবচেয়ে স্বর্গীয়।'

হোমারকে একইভাবে 'স্বর্গীয়' এবং হোমার পাঠকে 'ঐশ্বরিক অনুভূতি' বলেছেন শ্রেষ্ঠতম জার্মান কবি গ্যেয়টেও। ১৭৯৯ সালে গ্যেয়টে শুরু করলেন তাঁর অসম্পূর্ণ কবিতা 'অ্যাকিলিস' লেখা, উদ্দেশ্য ছিল মহাকাব্য লেখার জন্য 'আইডিয়ার সন্ধান' করা। গ্যেয়টে লিখলেন: 'ইদানীং আমি সবকিছু থেকে দূরে আছি *ইলিয়াড* অধ্যয়ন করব বলে; এটুকু দেখতে যে *ইলিয়াড* ও *অডিসি*-র মাঝখানে কোনো মহাকাব্যিক গল্প লুকিয়ে আছে কি-না। তবে আমি শুধু ট্র্যাজিক বিষয়-আশয়ই দেখতে পাচ্ছি।...অ্যাকিলিসের জীবন যেভাবে শেষ হল আর সে জীবনের যে পশ্চাৎপট, তা ফুটিয়ে তোলার জন্য মহাকাব্যিক ভঙ্গিমারই আশ্রয় নিতে হবে।'[৮] গ্যেয়টের কাছে হোমার ছিলেন 'কবি'-দের আদিমতম ও পরমতম সত্য এক রূপ, যে কবি প্রথমে বুকে ধারণ করেন তাঁর জনগণের সত্যকে এবং তারপরে পাঠকের বা শ্রোতার সামনে ফুটিয়ে তোলেন সুদূর এক ভবিষ্যৎকালের মানব-মানবীদের জীবনের সত্যগুলো। হোমারের মতো শিল্পীরা, গ্যেয়টে বিশ্বাস করতেন— তা তাঁরা রক্ত-মাংসের মানুষ হয়ে থাকুন আর একটি জাতির চেতনার অন্তর্গত কাব্যিক শক্তির রূপকই হয়ে থাকুন— বাস করেন সময়ের নিয়মের ও রীতির বাইরে, কারণ তাঁরা স্বর্গীয় বা ঐশ্বরিক

সত্তা, মানুষ ও দেবতাদের মধ্যেকার কথাবার্তার অনুবাদক ও বাহক।[৯] গ্যেয়টের হিসাবে, এই স্বর্গীয় হোমার প্রত্যেক প্রজন্মের জন্য সাংস্কৃতিক মুক্তির আস্বাদ পাবার সম্ভাবনা রাখেন, ঠিক যেমন গ্যেয়টে নিজে হতে চাইতেন জার্মান জাতির জন্য। এ দুই কবির মধ্যেকার সম্পর্কের কথা বলতে গিয়েই সাহিত্যের ইতিহাসবিদ আরনস্ট রবার্ট কার্টিয়াস পরে ঘোষণা করলেন: 'ইউরোপিয়ান সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা নায়কের নাম হোমার। আর এর শেষ সর্বজনীন লেখকটির নাম গ্যেয়টে।'[১০]

অ্যারিস্টোটল বলেছিলেন: 'মহাকাব্যকে হতে হবে...সহজ বা জটিল, চরিত্রের বিশিষ্টতার বা মানুষের দুর্দশার গল্প।... শেষে, এর ভেতরের চিন্তা ও শব্দচয়ন হতে হবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুন্দর। এই সব উপাদানই প্রথম দেখা যায় হোমারে; তিনি এগুলোর কার্যকর ব্যবহারও করেছেন বটে। তাঁর দুটি কাব্য...*ইলিয়াড* সরল ও এর গল্পটি মানুষের দুর্গতির; এবং *অডিসি* জটিল, আর এটা চারিত্রিক বিশিষ্টতারই এক কাহিনী। এ দুটি আসলে এর চেয়েও বেশি কিছু, যেহেতু শব্দচয়ন ও চিন্তার বিচারেও তারা অন্য সব কাব্যকে ছাড়িয়ে যায়।'[১১]

আর সাধু লন্‌জাইনেস তাঁর আনুমানিক প্রথম খ্রিস্টাব্দে লেখা প্রবন্ধ 'On the Sublime-এ বলেছিলেন: 'ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটাস একাই কি হোমারের এরকম বিমুগ্ধ অনুকরণকারী ছিলেন? না। তার আগে স্টেসিকোরাস, আরকিলোকাস ও সর্বোপরি প্লেটো— এঁরা সবাই অনুকরণ করতেন হোমারকে। প্লেটো হোমারের মহান উৎসমুখ থেকে নিজের দিকে টেনে নেন অগণন জলপ্রবাহকে।'[১২]

আর কে না জানে যে ভার্জিল তাঁর মহাকাব্য *ঈনিদ* (খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ৩০-১৯ সন) লিখেছিলেন সরাসরি হোমারেরই অনুকরণে? ভার্জিলকে বলা হয় 'হোমারের সবচেয়ে বিখ্যাত ছাত্র'। পুরো লাতিন সাহিত্যের ওপরে হোমারের প্রভাব ছিল সর্বব্যাপী ও নিরঙ্কুশ। তাঁর *ইলিয়াড*-এর ট্রোজান বীর ঈনিয়াস ট্রয়যুদ্ধের শেষে ট্রয় থেকে পালিয়ে চলে গেল ইতালি, প্রতিষ্ঠা করল রোমান সাম্রাজ্যের, জুলিয়ান বংশের প্রথম পুরুষ হল সে, আর ইতালীয়রা পেয়ে গেল তাদের ন্যাশনাল এপিক— ভার্জিলের *ঈনিদ*-এর ('ঈনিয়াসের গান') মধ্যে।

হোমার-অনুপ্রাণিত হয়ে পরে দান্তে লিখলেন তাঁর মহাকাব্য *ডিভাইন কমেডি*, যেখানে আমরা দেখা পাব *ইলিয়াড*-এর বেশ কিছু চরিত্রের; তারা এখন দান্তের নরকের বাসিন্দা। দান্তে তাঁর এই অমর কীর্তিটি লেখেন ট্রোজান যুদ্ধের আড়াই হাজার বছর পরে, ১৩০৮ সালের দিকে, আর আমরা দেখে অবাক হয়ে যাই দান্তের এই মধ্যযুগীয় পৃথিবীতে মৃত্যুর পরের যে জীবনের গল্প বলা হয়েছে সেটা থেকে হোমারের বলা মৃত্যুদেব হেডিসের জগতের ফারাক কতটা কম, তা লক্ষ করে। কথিত আছে, আলেকজান্ডার দি গ্রেট (খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৬-৩২৩ সাল) যেমন তাঁর পারস্য ও ভারতবর্ষ অভিমুখী দীর্ঘ সামরিক অভিযানগুলোতে হোমারের *ইলিয়াড*-এর কপি সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন এবং প্রতি রাতে ঘুমাতে যাবার আগে পাঠ করতেন, তেমন দান্তে গ্রিক না জানা থাকার ফলে হোমার পড়তে পারেননি ঠিকই, কিন্তু তিনি যেহেতু জানতেন যে ভার্জিলের *ঈনিদ* হোমার-অনুপ্রাণিত এবং *ঈনিদ*-এর মধ্যে

পুরোপুরি হাজির আছেন হোমার, তাই তিনি *ঈনিদ*-এর কপি নাকের সামনে ধরে শুঁকতেন হোমারের স্বাদ-গন্ধ নেবার জন্য ।[১৩]

অন্য গবেষকদের অভিমত, দান্তে ও তাঁর সমকালীন কবিরা এই দীর্ঘ শতাব্দীর বিশ্বাসকে মেনে নিয়েছিলেন যে হোমারই 'সর্বকালের সেরা কবি'। তাঁরা সম্ভবত লাতিন অনুবাদে হোমার পড়েছিলেন জনপ্রিয় *Ilias Latina* পাঠ করার মধ্য দিয়ে, যার লেখক (অনুবাদক) ছিলেন অজ্ঞাত, এবং যা লাতিনে ভাষান্তর হয়েছিল ১ম খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময়ে ।[১৪] পেত্রার্ক পুজো করার মতো করে হোমারের *ইলিয়াড*-এর গ্রিক পাণ্ডুলিপিটি পাশে রাখতেন সবসময়, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি গ্রিক জানতেন না। কনস্টান্টিনোপল থেকে তাঁর যে বন্ধু তাঁকে এই গ্রিক *ইলিয়াড* পাঠায়, তাঁকে পেত্রার্ক উত্তরে লেখেন: 'তোমার হোমার আমার পাশে বোবা হয়ে শুয়ে আছে, আর আমি শোওয়া তার পাশে বধির হয়ে। প্রায়ই আমি বইটাকে চুমু খাই আর বলি: "হে মহান লেখক, আহা আমি যদি তোমার কথাগুলো একটু শুনতে পেতাম"' ।[১৫] পরে পেত্রার্কের উপদেশ মোতাবেক এবং বোক্কাচিও-র সহায়তা নিয়ে তাঁদের দুজনের বন্ধু লিওনসিও পিলাতো লাতিনে প্রথম *ইলিয়াড* ও *অডিসি*-র অনুবাদ করেন, যা মানের দিক থেকে ছিল যথেষ্ট নিম্নস্তরের ।[১৬]

শুধু মধ্যযুগের দান্তেই নন, পরে সপ্তদশ শতকের ইংরেজ কবি জন মিলটন (১৬০৮-১৬৭৪) লিখলেন তাঁর অমর মহাকাব্য *Paradise Lost*। ১৬৬৬ সালে প্রকাশ হওয়া এই বারো পর্বের দীর্ঘ কাব্যটি শুরুই হয় হোমারের *ইলিয়াড*-এর শুরুর মতো স্মৃতি ও কাব্যের দেবী মিউজের প্রতি আবাহন রেখে। বাইবেল অনুসারে মানুষের স্বর্গ থেকে পতনের এই অনবদ্য কাব্যের পরতে পরতে বিদগ্ধ পাঠক খুঁজে পান হোমার ও ভার্জিলের ছায়া।

এ-বইটির শেষ প্রচ্ছদে গ্যেয়টের এক বিখ্যাত উক্তি আছে যে হোমার তাঁকে 'সবসময় ঠেলে দেয় আশ্চর্য বিস্ময়ের জগতে।' সেই কথাটা আর একটু বিশদ করে বলার লোভ সামলাতে পারছি না। গ্যেয়টে একদম কিশোর বয়সেই পড়ে ফেলেন তিনটি বই: *আরব্য রজনীর কাহিনী*, *ইলিয়াড* ও *অডিসি*।[১৭] গ্যেয়টের বিখ্যাত উপন্যাস *The Sorrows of Young Werther* ('তরুণ ভারথারের দুঃখবিষাদ', ১৭৭৪), যা অনেকাংশেই তাঁর আত্মজীবনীমূলক এক আখ্যান— সেখানে ভারথার তার গোপন চিঠিগুলোর প্রাপককে লেখে যে সে আর নতুন কোনো বই চায় না, কোনো দিকনির্দেশনাও চায় না জীবনে, কোনো উৎসাহও চায় না কারও থেকে; সে শুধু চায় 'আমাকে দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুম পাড়াবে এমন ঘুম-পাড়ানিয়া গান, যা আমার হোমারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণেই আছে।' এই গ্যেয়টেই ১৮২৭ সালে তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রামাণ্য সংস্করণের চতুর্থ খণ্ডে ঢুকিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন এক দীর্ঘ কবিতার খণ্ডাংশ, bvg 'Helena: A Classical Romantic Phantasmagoria', নিচে সাবটাইটেলে লেখা '*ফাউস্ট*-এর জন্য সাংগীতিক মধ্যবর্তিকা'। আমরা জানি, *ফাউস্ট* গ্যেয়টের সেরা সাহিত্যকর্মের নাম। *ফাউস্ট*-এর গ্রেটখেন আর *ইলিয়াড*-এর হেলেনের মধ্যে কীভাবে গ্যেয়টে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন তা আমরা জানি না, কিন্তু গ্যেয়টের ভাষ্য অনুযায়ী এ দুই নারীচরিত্রই 'ভুল শিক্ষা, মধ্যবিত্তের মানসিক সংকীর্ণতা, নৈতিক অবক্ষয় ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিভ্রমের শিকার'।[১৮] বলা হয়ে থাকে, হেলেন শুরু হয় হোমারের হাতে, আর শেষ হয় গ্রেটখেন চরিত্রটির মধ্য দিয়ে গ্যেয়টের হাতে।[১৯]

১৮৩২ সালে গ্যেয়টে, মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে, শেষ করলেন তাঁর আত্মজীবনীর শেষ অধ্যায় লেখা। সেখানে তিনি ঊনবিংশ শতককে সৌভাগ্যময় এক শতক বললেন শুধু এ-কারণেই যে, এ শতকটিতে হোমারের পুনর্জন্ম হয়েছে। তিনি লিখলেন: 'সাহিত্যিক সেই কালপর্বটি সুখী এক কালপর্ব হতে বাধ্য যখন অতীতের মহান সৃষ্টিগুলোর আবার পুনরুত্থান ঘটে, এবং সেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের অংশ হয়ে ওঠে; কারণ কেবল তখনই ওসব সাহিত্যকর্ম নতুন এক অর্থ ও অভিঘাতের জন্ম দিতে পারে। আমাদের জন্য হোমারের সূর্য আবার জাগল, এবং তা আমাদের সময়কার প্রয়োজনীয়তার শর্ত পূরণ করেই...আমরা তাঁর ঐ কাব্যদুটোতে আর এখন হানাহানিতে ভরা, বীরদের বাড়াবাড়ির এক পৃথিবীকে দেখি না, বরং দেখি প্রয়োজনীয় এক বর্তমানের আয়নায় প্রতিফলিত সত্যকে। আমরা (এ শতকে) চেষ্টা করেছি হোমারকে যতটা সম্ভব আমাদের লোক করে নেওয়ার।'[২০]

ষোড়শ শতকের একদম শেষভাগে ক্রিস্টোফার মারলো গ্যেয়টের *ফাউস্ট* কাহিনীর আলোকে তাঁর লেখা *Tragical History of Dr Faustus*-এ ইংরেজি ভাষায় প্রথম নাট্যরূপ দিলেন জাদুকর ডাক্তারের সঙ্গে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রূপসী নারীটির (হেলেন) সেই কিংবদন্তিসম সাক্ষাতের। সেখানে হেলেনের বর্ণনায় তিনি লিখলেন পরবর্তীকালে আরেক কিংবদন্তি হয়ে যাওয়া তাঁর পঙ্‌ক্তিগুলো:

> Was this the face that launch'd a thousand ships,
> And burnt the topless tower of Ilium?
> Sweet Helen, make me immortal with a kiss.[21]

সেই থেকে হেলেনকে আমরা চিনি এক ভয়ংকর সুন্দরী হিসেবে, যার রূপের মোহে পড়ে রওনা দিয়েছিল হাজার জাহাজ। প্রসঙ্গত, ট্রয় অভিযানে গ্রিক রাজা আগামেমননের সঙ্গে এসেছিল মোট ১১৮৬টি জাহাজ, তারা ট্রয়ের পথে পাল তুলেছিল গ্রিসের আউলিস বন্দর থেকে *ইলিয়াড*-এর কাহিনীর সময়কালের দশ বছর আগে।

ক্রিস্টোফার মারলো-র আড়াইশ বছর পরে এডগার অ্যালান পো হেলেনের অবিনশ্বর সৌন্দর্যকে সমার্থক করলেন প্রাচীন পৃথিবীরই অপার সৌন্দর্যের সঙ্গে:

> Helen, thy beauty is to me
> Like those Nicaean barks of yore
> That gently, o'er a perfumed sea,
> The weary, wayworn wanderer bore
> To his own native shore.[22]

এই যে সুগন্ধিভরা সাগরের ওপর দিয়ে মৃদুমন্দ হাওয়া বয়ে যাওয়ার ক্লাসিক্যাল পৃথিবী, তার শুরুটাই হোমারের হাত দিয়ে। গ্রিসে, হোমারের মৃত্যুর আনুমানিক তিন শ বছর পরে, সক্রেটিসের জীবনকালে, *ইলিয়াড* আবৃত্তির সময়ে চারণকবিদের হাতে আর সেই আগের যুগের বীণা ও বাদ্যযন্ত্র নেই। এ নতুন যুগের চারণকবিরা খুব সুন্দর সব পোশাক পরে এবং

হাতে সুদর্শন ছড়ি ধরে *ইলিয়াড* ও *অডিসি* পড়ছেন শ্রোতাদের সমাবেশে। সক্রেটিস ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়লেন নতুন যুগের এই চারণকবিদের দেখে। তিনি বললেন: 'তোমরা যারা গীতিকবি, তাদের পেশাটা দেখে আমার প্রায়ই হিংসা হয়। তোমাদের শিল্পচর্চার দাবি মেটানোর জন্য তোমরা কী সুন্দর সব কাপড় পরো, যতটা পারা যায় নিজেদেরকে সুন্দর করে উপস্থাপন করো, আর তোমরা অনেক চমৎকার সব কবির সৃষ্টি বিষয়ে কত ভালোভাবেই না জানো, বিশেষ করে হোমারকে নিয়ে, হোমার— সবার থেকে সেরা এবং সবচেয়ে স্বর্গীয়।'[২৩]

হোমারের কবিতার এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য, এই অপার্থিব গীতিময়তা বিরাটভাবে মুগ্ধ করেছিল কবি এজরা পাউন্ডকে। একবার এক সংগীতজ্ঞ পাউন্ডকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কোথায় তিনি পেতে পারেন সবরকমের সব কবিতার সন্ধান, অর্থাৎ যেভাবে ইয়োহান সেবাস্তিয়ান বাখের সংগীতের মধ্যে পাওয়া যায় সকল সংগীতের খোঁজ? পাউন্ডের উত্তর ছিল, কেউ যদি সত্যি গ্রিক ভাষা শিখে ফেলেন তো সব কবিতার সন্ধান তিনি একসঙ্গে পেয়ে যাবেন, অথবা এক হোমারের মধ্যেই পেয়ে যাবেন মোটামুটি এর পুরোটাই।[২৪]

হোমারকে নিয়ে প্রশস্তিগাথা আসলে শেষ হবার নয়। এ বিষয়ে এক-দুটি প্রমাণ সাইজের বই লিখে ফেলা যায় শুধু আমার নিজের সংগ্রহে যে সমস্ত বইপুস্তক আর নিবন্ধ রয়েছে সেগুলোর সাহায্য নিয়েই। আমরা বরং শেষ করে আনি 'ভূমিকা'-র এ অংশটি। এর শেষের জন্য টলস্টয়ের নিবন্ধটি নয় (যেটার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ দেওয়া আছে এ-বইতেই, যেখানে হোমারের প্রশংসা করতে গিয়ে টলস্টয় শেকস্‌পিয়ারকে শিল্প বা কাব্যের সঙ্গে পুরোপুরি যোগাযোগহীন বলতেও ছাড়েননি), বরং সবচেয়ে ভালো হয় যদি আমরা চোখ রাখি মহান কবি আলেকজান্ডার পোপের ১৭১৫ সালে লেখা *ইলিয়াড*-এর 'ভূমিকা'-র অল্প কয়েকটি লাইনের দিকে:

'বিশ্বজনীনভাবেই হোমারকে দেওয়া হয়েছে সকল লেখক-কবির মধ্যে মহত্তম সৃষ্টিটির স্রষ্টার স্বীকৃতি। বিচারকের প্রশস্তিগাথা পাবার জন্য ভার্জিল তাঁর সঙ্গে ন্যায্যভাবেই প্রতিযোগিতা করেছেন, আর অন্যেরাও কোনো না কোনো বিশেষ উৎকর্ষের দাবিদার হয়ে আছেন বটে; কিন্তু হোমারের সৃষ্টি এখনও রয়ে গেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন। তাঁকে যদি কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হিসেবে কোনোদিন স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে তো তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ কবিতার যা কিছু ভিত্তিমূল সে সবে তিনিই সবচেয়ে বেশি উৎকর্ষ দেখিয়েছেন।...

'আমাদের এই লেখকের কাজটি (*ইলিয়াড*) এক বন্য বেহেশত্। আমরা যদি এর সম্পূর্ণ সৌন্দর্যকে কোনো সাজানো বাগান দেখার মতো করে আলাদা আলাদাভাবে দেখতে ব্যর্থ হই, তবে তা কেবল এ-কারণেই যে এর (*ইলিয়াড*) সৌন্দর্যগুলোর মোট সংখ্যা অগণনীয় রকমের বেশি।'

আগেই যেমন বলেছি, ক্লাসিক্যাল পৃথিবীর শুরুই হয় হোমারের হাত ধরে। প্রাচীনকালের গ্রিকদের সামনে কোনো পবিত্র আসমানি কিতাব ছিল না, যেমন বাইবেল বা কোরান। তাদের ছিল শুধু হোমার। হোমার শুধু তাদের সাহিত্যেরই স্রষ্টা নন, তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনেরও উৎসমুখ। গ্রিক মূল ভূখণ্ড ও দ্বীপগুলো থেকে আসা

কবি ও বিজ্ঞানীরা; আথেন্সের ট্র্যাজেডি ও কমেডি নাটকের নাট্যকারেরা এবং ফুলদানির চিত্রশিল্পীরা; সিসিলির বাগ্মীপুরুষ ও মন্দির-নির্মাতারা; সব শ্রেণির রাজনীতিবিদ ও দর্শনের নানা ধারা ও উপধারার দার্শনিকেরা— এই নানা পেশার, নানা-চরিত্রের নানান মানুষেরা সবাই দেখা যেত স্রেফ একটি বিষয়েরই স্বচ্ছ জ্ঞান রাখে: হোমার। প্রকৃত অর্থেই সে যুগে ভূমধ্যসাগরের সবদিক বেড় দিয়ে— পশ্চিমে মার্সেই থেকে উত্তর-আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত আর পুবে কৃষ্ণ সাগর, এই বিস্তৃত এলাকার ভিন্ন ভিন্ন মানুষ, ভিন্ন সব সংস্কৃতি আর ভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের জায়গাটাতে— হোমারই ছিলেন একমাত্র আঠা, তিনিই ধরে রেখেছিলেন এর পুরোটাকে, যাকে আমরা আজ প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা নামে জানি। খ্রিস্টের জন্মের পরে, প্রথম শতকে, রোমান ইতিহাসবিদ কুইন্‌টিলিয়ান (Quintilian) হোমারকে তুলনা করলেন ওশেনাস নদীর সঙ্গে (যে ওশেনাসের কথা আমরা পড়ব *ইলিয়াড*-এ), যে নদী প্রাচীনকালের মানুষদের বিশ্বাস করা সমতল ও ডিস্ক-সদৃশ এক পৃথিবীকে বেড় দিয়ে রেখেছে এর সবপাশে। সবকিছুই তখন হোমার থেকে প্রবাহিত হত, আবার হোমারেই ফিরে যেত। এই একই কথা, রূপক অর্থে, আমাদের আজকের পৃথিবীর সংস্কৃতি-সমাজ-রাজনীতির জন্যও প্রযোজ্য।[২৫]

হোমার ও তাঁর কীর্তি: সারসংক্ষেপ

যে সমস্ত পাঠকের এত দীর্ঘ ভূমিকা পড়ার মতো সময় ও ধৈর্য নেই, তাদের জন্য এ-অংশে থাকছে হোমার ও তাঁর সৃষ্টি বিষয়ক এই ভূমিকাটির সংক্ষিপ্ত এক রূপ। অন্য সব পাঠকের জন্যও মূল 'ভূমিকা'র বিশদ অংশগুলোয় প্রবেশের আগে এই অংশটি সারসংক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে।

হোমার (Homeros) প্রাচীন গ্রিসের দুই সর্বপ্রাচীন মহাকাব্যের কথিত স্রষ্টা— *ইলিয়াড* ও *অডিসি*। গ্রিকরা নিজেরাও চিরকালই সন্দিহান ছিল যে হোমার নামের কেউ আদতেই ছিলেন কিনা এবং থাকলেও তিনি কোন্ সময়কালের, তা নিয়ে। এইসব সন্দেহের সাগর পেরিয়ে এখন বরং সাধারণভাবে এটাই বিশ্বাস করা হয় যে, যদি হোমার নামে বাস্তবে কেউ থেকেও থাকেন, তবু তিনি আমাদের হাতে আছে যে *ইলিয়াড* ও *অডিসি*, সে দুটোর সাজানো-গোছানো এবং সম্পাদনার চেয়ে বেশি কাজ বোধহয় করেননি।

১৯৩০ সালে আমেরিকান গবেষক মিলম্যান প্যারি ও আলবার্ট বি লর্ড বলকান অঞ্চলের চারণকবিদের কাব্যের প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করে আমাদের জানালেন যে, হোমারের কাব্যগুলো বাচনিক কবিতারই (oral poetry) ঐতিহ্য ধারণ করে আছে, যে ঐতিহ্য অনুযায়ী চারণকবিরা বা সুরকাররা (rhapsodes) দীর্ঘ কাব্যের সুদীর্ঘ সব অংশ মুখস্থ করে রাখতেন এবং স্মৃতি থেকে তা পাঠ করতেন জড় হওয়া বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে কিংবা রাজা ও গোত্রপতিদের দরবারে। এই যুগান্তকারী তত্ত্ব মেনে নিলে এটাও মানতে হয় যে খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে ১১০০ সালের মধ্যে সংঘটিত ট্রোজান যুদ্ধ বিষয়ক এক কাব্য মানুষের মুখে মুখে, বংশ থেকে বংশপরম্পরায় এমনিতেই জারি ছিল, যা পরে হয়তো হোমার নামের অত্যন্ত মেধাবী ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা-চিন্তায় সমৃদ্ধ একজন মানুষ খ্রিস্টপূর্ব

অষ্টম থেকে সপ্তম শতকের কোনো এক সময়ে সার্বিক সংগ্রহ, সম্পাদনা ও পুনর্গঠনের কাজটি করেন। আমাদের *ইলিয়াড* ও *অডিসির*, যদি ব্যাপারটা মিলম্যান প্যারির তত্ত্ব মোতাবেক ঘটে থাকে, আদিতম কিছুটা গোছানো রূপ হয়তো ওটাই ছিল। সে অর্থে হোমার নামের সেই লোকই যে এর স্রষ্টা তা পরোক্ষভাবে দাবি করাই যায়। চার-পাঁচশ বছর ধরে নানা অঞ্চলের নানা চারণকবির মুখে মুখে যে মহাকাব্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নানা রূপে টিকে ছিল, তার গোছানোর ও সম্পাদনার কাজটা, লিখন-প্রচলনের আগের সেই যুগে, নিঃসন্দেহে বিরাট-বিশাল এক কাজ ছিল বৈকি।

হোমেরিক কাব্যের কোনো কোনো অংশ একটা আরেকটার চেয়ে আগের বলে ধরা হয়— যেমন আমরা মোটামুটি নিশ্চিত যে, *ইলিয়াড* সৃষ্টি হয়েছিল আগে আর *অডিসি* পরে, কারণ *অডিসির* ভেতরে *ইলিয়াড*-এ ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনার রেফারেন্স আছে, কিন্তু এর উল্টোটা সত্য নয়। গবেষকদের অভিমত, এই *ইলিয়াড*-এর কোনো কোনো অংশ আবার তথাকথিত ট্রোজান যুদ্ধেরও আগের সৃষ্টি (১১৮৪ খ্রিস্টপূর্ব সনকে ধরা হয় ট্রোজান যুদ্ধের বছর হিসেবে, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এখন আবার দাবি করছেন যে ট্রোজান যুদ্ধ ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব ১২২০ সনে)। এরই উল্টো দিকে, গবেষকেরা এটাও মনে করেন যে এই *ইলিয়াড*-এর (এবং *অডিসিরও*) কোনো কোনো অংশ আবার অনেক পরের (আগের অংশগুলোর তুলনায় প্রায় পাঁচশ বছর পরের) সৃষ্টি। হোমার এই কালিক বিচারে আগের ও পরের, নানা কালপর্বের, মুখে মুখে নির্মিত দুই দীর্ঘ কবিতার নানা অংশকে একত্রে গাঁথলেন খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ সনের কাছাকাছি গিয়ে। এখন যা কিছু আমরা হোমারের সৃষ্টি বলে জানি, তার সবই গ্রিক ভাষার আয়োনিক (Ionic) ডায়ালেক্টের (dialect; ভাষার আঞ্চলিক রূপ) এক প্রাচীন রূপ দিয়ে গড়া। এখন যা পশ্চিম তুরস্ক, সে অঞ্চলেই চল ছিল গ্রিক ভাষার এই আয়োনিক আঞ্চলিক রূপের। সে কারণে গবেষকদের অভিমত, হোমার গ্রিসের মূল ভূখণ্ডের লোক নন, তিনি এশিয়া মাইনরের (তুরস্ক ছিল যার অংশ) কেউ ছিলেন।

গ্রিসের সাতটি শহর— মূল ভূখণ্ডের এবং একই সঙ্গে ঈজিয়ান সাগরের কিছু দ্বীপ— হোমারের জন্মস্থানের দাবিদার। প্রথাগত বিশ্বাস এটাই যে, হোমার অন্ধ ছিলেন। এই ধারণার পেছনে আছে তথাকথিত ‘হোমেরিক স্তোত্রগীত’ (Homeric Hymns)-এর একটি অংশ। জেনে রাখা ভালো, ‘হোমেরিক স্তোত্রগীত’ তেত্রিশটি কবিতার এক সংকলন যেখানে এক অন্ধ কবি বন্দনা জানাচ্ছেন গ্রিক দেবদেবীদের উদ্দেশে। একথা সত্যি যে, সে যুগের অনেক চারণকবি ও গীতিকার বাস্তবেই অন্ধ ছিলেন। অন্ধ মানুষদের হয়তো পেশাই ছিল বীণা বাজাতে বাজাতে গান শুনিয়ে ভিক্ষা করা, আর তাঁদের সে গানই ছিল আমাদের আজকের এই *ইলিয়াড* বা *অডিসি*।

ইলিয়াড ও *অডিসি* মহাকাব্যদুটো যার যার মতো করে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তারা দুটো মিলে আবার একসঙ্গে একটা ইউনিটের মতো। তারপরও বিষয়বস্তু ও টোনের দিক থেকে এ দুই মহাকাব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন চারিত্রের। *ইলিয়াড*-এর বিষয়বস্তু ট্রোজান যুদ্ধ নয়, বরং এটা ট্রোজান যুদ্ধের শেষদিকের মাত্র পঞ্চাশ দিনের এক কাহিনী, যা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি তার আগের দশ বছরে ঘটে যাওয়া ট্রোজান যুদ্ধের নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন কখনও

কখনও। ট্রোজান যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল আনুমানিক ১১৮৪ খ্রিস্টপূর্ব সালে, আর— আগেই যেমন বলেছি— *ইলিয়াড* একত্রে গাঁথা হয় আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ বা ৬০০ সালের দিকে। ট্রোজান যুদ্ধের দুটি পক্ষ ছিল: একদিকে গ্রিকরা, অন্যদিকে ট্রোজানবাহিনী ও তাদের মিত্রেরা, আর এর ঘটনাস্থল ছিল ট্রোয়াড অঞ্চল (ট্রয় শহরের আশেপাশের অঞ্চলকে বলা হয় ট্রোয়াড; অবস্থান তুরস্কের উত্তর-পশ্চিমে, আনাতোলিয়ায়)। প্রসঙ্গত ট্রয়ের অধিবাসীদেরকে বলা হত ট্রোজান। গ্রিক-ট্রোজান এই দশ বছরব্যাপী যুদ্ধের পেছনের পোশাকি কারণ ছিল ট্রয়ের যুবরাজ প্যারিস কর্তৃক গ্রিসের স্পার্টার রানি হেলেনের অপহরণ। হেলেন ছিল স্পার্টার রাজা মেনেলাসের স্ত্রী, আর মেনেলাস ছিল মাইসিনির রাজা আগামেমননের ছোট ভাই। রানির অপহরণে অপমানিত, ক্ষুব্ধ গ্রিকরা তাদের এই রানিকে দেশে ফিরিয়ে আনতে এবং ট্রোজানদের এই ঘৃণ্য কাজের উচিত শিক্ষাটি দিতে প্রায় বারোশত জাহাজ নিয়ে জড় হল ট্রয়ের উপকূলে, ট্রয় নগর গুঁড়িয়ে দেবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বুকে পুষে। প্রতিশোধপরায়ণ এই বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ আগামেমনন, আর অ্যাকিলিস তাদের সেরা যোদ্ধা।

ইলিয়াড-এর কাহিনী গ্রিক বনাম ট্রোজানবাহিনীর মধ্যেকার সংগ্রামের চাইতে অনেক বেশি গ্রিক বীর অ্যাকিলিসের দুই পর্বের দুই ক্রোধ দিয়ে গড়া: প্রথমে সে ক্রোধান্বিত তারই রাজা আগামেমননের প্রতি, আর পরে সে ক্রোধে ফুঁসছে সেরা ট্রোজান যোদ্ধা হেক্টরের ওপরে, কারণ হেক্টর তার প্রিয়তম বন্ধু প্যাট্রোক্লাসকে খুন করেছে। ট্রোজান যুদ্ধকে পশ্চাৎপটে রেখে *ইলিয়াড* তাই যতটা না জাতিতে জাতিতে এক যুদ্ধের গাথা, তার চেয়ে বেশি এর কয়েকটি প্রধান চরিত্রের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিবরণ। আর যদিও যুদ্ধ এ মহাকাব্যের সবথেকে বেশি অংশ জুড়ে আছে, তবু এতে যুদ্ধের রক্তপাত ও নৃশংসতার বাইরে গিয়ে রয়েছে নিজস্ব এক উচ্চাঙ্গের টোন, এক অভিজাত, পরিশীলিত, মার্জিত চেহারা, যা সাক্ষ্য দেয় গ্রিক সভ্যতার ক্লাসিক্যাল যুগ পূর্ববর্তী ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের রুচি-পছন্দেরই। এ মহাকাব্যের ইতি ঘটে অ্যাকিলিসের হাতে ট্রোজান হেক্টরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। আমরা দেখি অ্যাকিলিস হেক্টরের মরদেহ পুরো ট্রোজান জাতির সামনে দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে গ্রিক শিবিরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যে মরদেহ শেষে সে ফেরত দেবে হেক্টরের পিতা প্রায়ামের কাছে। *ইলিয়াডেই* আমরা জানতে পারি যে, অল্প কদিনের মধ্যেই অ্যাকিলিসেরও মৃত্যু ঘটবে, ট্রয় নগরের পতন হবে ইত্যাদি, কিন্তু *ইলিয়াড*-এ সেসবের কিছুই নেই, নেই বিখ্যাত 'ট্রোজান ঘোড়া'র প্রসঙ্গও। *ইলিয়াড* সে-সবকিছুর পূর্বসংকেত রেখে শেষ হয় হেক্টরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিবরণ রেখে।

ইলিয়াড-এর ঘটনাপরম্পরা কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার নিখুঁত বিবরণ নয় নিশ্চয়ই। গবেষকদের অভিমত, ট্রোজান যুদ্ধের মতো কোনো যুদ্ধ আসলেই সংঘটিত হয়েছিল একদিন; কিন্তু হেলেন নামের এক নারী তার পেছনের কারণ ছিল কি না, বা সেই যুদ্ধটি দুই ভিন্ন জাতির লোকদের মধ্যে (গ্রিকরা বনাম এশিয়া মাইনরের ট্রোজানরা) ঘটেছিল কি-না, সে বিষয়ে তারা নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারছেন না। ইতিহাসবেত্তাদের অবশ্য বিশ্বাস, এ-যুদ্ধ দুই ভিন্ন জাতির মধ্যে ঘটেনি, ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে প্রথমদিককার গ্রিকদের (যাদের আমরা মাইসিনিয়ান গ্রিক নামে চিনি) দুই দলের মধ্যে; আর সে যুদ্ধের

কারণ ছিল কোনো নারী নয়, বরং কৃষ্ণসাগর অভিমুখে প্রবাহিত সংকীর্ণ পানিপথের (যার নাম হেলেস্‌পন্ট) নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব লাভের বিষয়টা। ইতিহাসবেত্তাদের এসব অভিমতের পেছনেও জোরালো কোনো ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ যে রয়েছে, তেমন নয়। এই ইতিহাসবেত্তারাই বর্তমানে চালু ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত ও পোক্ত করেছেন যে, ট্রোজান যুদ্ধ যতটা না ছিল এক নারীর অপহরণ বিষয়ক আপাত হাস্যকর এক কারণের ওপর দাঁড়ানো কোনো ঘটনা, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল ঐ অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তার ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রিকদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রকাশ।

অন্য মহাকাব্য *অডিসি*-র প্রসঙ্গে বলতে হয়, কবি এই বাচনিক কবিতাটি (oral poem) জড় করে একত্রে গাঁথেন *ইলিয়াড* গাঁথা হয়ে যাওয়ার অনেক পরে। এই অনুমানের পেছনে দুটি শক্ত কারণ আছেঃ এক. আগেই যেমন বলেছি, *অডিসি*-তে রয়েছে *ইলিয়াডে*র নানা ঘটনার উল্লেখ, আর এতে বলাই আছে যে, এখানে *ইলিয়াড*-এর অন্যতম নায়ক অডিসিয়ুস বাড়ি ফিরে যাচ্ছে ট্রোজান যুদ্ধের শেষে; দুই. *অডিসি*তে কবির ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল সম্বন্ধে অনেক বেশি জানাশোনা স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। গ্রিকদের এ-অঞ্চল সম্বন্ধে এতটা প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ হয় খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে গ্রিকরা ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে নানা উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা এবং দ্বীপ ও রাজ্যগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপনের পরেই। অন্য কথায়, *অডিসি*-তে এ অঞ্চল বিষয়ক যে বিশদ জ্ঞানের দেখা মেলে, তা অষ্টম শতকে গ্রিক সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটার আগে কারও পক্ষে লাভ করা সম্ভব ছিল না। অতএব মানুষের মুখে মুখে *ইলিয়াড* সৃষ্টি হতে থাকার শুরু যেখানে খ্রিস্টপূর্ব বারোশত সালের দিকে, সেখানে *অডিসি*রটা অষ্টম শতকের কিছু আগে-পরে।

অডিসি ট্রোজানযুদ্ধ শেষে গ্রিক বীর অডিসিয়ুসের ট্রয় থেকে বাড়ি ইথাকায় ফেরার এক দশ বছরব্যাপী দীর্ঘ সংগ্রামের অ্যাডভেঞ্চারমূলক উপাখ্যান। সমুদ্রপথে তার এই দশ বছরের বিপদসংকুল সফর তাকে নিয়ে যায় দূর পশ্চিমের হেসপিরিদেস (সম্ভবত এখনকার জিব্রাল্টার) থেকে শুরু করে এমনকি মৃত্যুর পরের জগতেও, যেখানে তার সঙ্গে দেখা হয় অনেক মৃত বন্ধুর আত্মার, যেমন অ্যাকিলিসের। শেষমেশ অডিসিয়ুস ঘরে ফেরে, তার ঘর গ্রিসের পশ্চিম উপকূলের ইথাকা; এবং সে তার অবর্তমানে তার স্ত্রী পেনেলোপিকে বিশ বছর ধরে উত্যক্ত করতে থাকা প্রেমপ্রত্যাশীদেরকে একে একে হত্যা করে স্ত্রী পেনেলোপি ও পুত্র টেলেমেকাসের সঙ্গে একত্রিত হয়।

ইলিয়াড একটি ট্র্যাজেডি (বিশ্বসাহিত্যের প্রথম ট্র্যাজেডি) আর অডিসি‌তার সুখে ভরা সমাপ্তির মধ্য দিয়ে— এক অ্যাডভেঞ্চার গাথাভিত্তিক বা রূপকথাসুলভ কমেডি। গ্রিকরা এই *ইলিয়াড* ও *অডিসি*-র পাশাপাশি আরও কিছু কাজকে দাবি করেছেন হোমার বা হোমেরিদে-র (Homeridae—হোমার সম্প্রদায়; আক্ষরিক অর্থে 'হোমারের পুত্রেরা') সৃষ্টি হিসেবে। এর মধ্যে আছে 'ট্রোজান মহাকাব্য চক্র' (Trojan Epic Cycle) যা গঠিত মোট আটটি (মতান্তরে বারোটি) মহাকাব্য নিয়ে। এই আটটিরই দুটি হচ্ছে টিকে থাকা এপিক— *ইলিয়াড* ও *অডিসি*; যেখানে অন্য ছয়টি টিকে আছে স্রেফ সামান্য কিছু খণ্ডাংশের ওপর ভিত্তি করে। ওই ছয়টির বিষয়বস্তু *ইলিয়াড*-এর আগের ও পরের ট্রোজান যুদ্ধের নানা কাহিনী,

নানা ঘটনা, যেগুলো *ইলিয়াড*-এ স্থান পায়নি। হোমারের সৃষ্টি হিসেবে আরও ধরা হয় *Homeric Hymns*-কে (হোমারের স্তোত্রগীতি) যার কথা আগেই বলেছি, এবং সেইসঙ্গে তিনটি প্যারোডিকে: 'The Margites'; 'The Cercopes' (অর্থাৎ Monkey-Man বা বাঁদর-মানুষ); এবং 'The Batrachomyomachia' (Battle of the Frogs & Mice; ব্যাঙ ও ইদুঁরের যুদ্ধ)। এই তিন প্যারোডির প্রথম দুটির স্রেফ সংক্ষিপ্ত কিছু খণ্ড টিকে আছে। এ সবকিছুই, হোমারবিদদের অভিমত, হোমার *ইলিয়াড* ও *অডিসি*-কে তাদের বর্তমান রূপ দেবার অনেক পরের কাজ। এগুলোর সৃষ্টির কাল হিসেবে ধরা হয়ে থাকে সপ্তম থেকে পঞ্চম খ্রিস্টপূর্ব শতককে, অর্থাৎ এ দুইশ বছরের মাঝের কোনো এক কালকে।

একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, হোমারের কাব্যগুলো, তাদের অন্তর্গত অভিঘাত ও অবস্থানের দিক থেকে, গ্রিকদের কাছে ছিল বাইবেল বা কোরানের মতো। এই কাব্যগুলোতেই তারা খোদা বা ঈশ্বর বলে যা কিছুকে বিশ্বাস করত তার সবকিছুর সম্মিলন আছে। বাইবেলের খোদা বা নবীদের মতোই অবস্থানে রয়েছে এই মহাকাব্য দুটির জিউস, হেরা, অ্যাথিনা, অ্যাপোলো, হারমিস ও অন্যেরা, যারা বাস করত উত্তরপূর্ব গ্রিসের অলিম্পাস পর্বতের চূড়ায়। *ইলিয়াড* ও *অডিসির* এভাবে প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায় ধর্মগ্রন্থের স্থান নিয়ে দেবার দিকটি আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। এ অর্থে, *ইলিয়াড* নামের রাজনৈতিক উপাখ্যানটির এক ধর্মতাত্ত্বিক দিকও আছে, যেমন আছে *অডিসি* নামের অ্যাডভেঞ্চারটির।

হোমার পরবর্তীকালের গ্রিক এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্য ও শিল্পকলায় বিরাট প্রভাব রাখেন। গ্রিক ও রোমান সাহিত্যিকেরা হোমারের *ইলিয়াড* ও *অডিসিকে* যে কী বিশাল সম্মানের আসনে রেখেছিলেন, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তাদের কেউই, একবারের জন্যও, অ্যাকিলিস-হেক্টর-অডিসিয়ুসের এই কাহিনীদুটোর কোনো পুনর্গঠন বা পুনর্লিখন করেননি, যদিও আমরা তাদেরকে হরহামেশা দেখেছি বাকি সব গ্রিক বীর ও দেবদেবীর কাহিনীগুলো নিয়ে কবিতা, নাটক বা ইতিহাসের বই লিখতে। *ইলিয়াড* ও *অডিসির* সম্মান ও অবস্থান পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর মতো এক উচ্চাসনে ছিল বলেই এ দুটোতে কখনোই হাত দেননি তারা।

খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬-৭০০ সালের দিকে (বিখ্যাত ইতিহাসবিদ হেরোডোটাসের মতে হোমারের জন্মসাল খ্রিস্টপূর্ব ৮৫০) গ্রিসে প্রথম চালু হয় লিখনের। এর আগে (খ্রিস্টপূর্ব ১১০০ সালের দিকে) ছিল মাইসিনিয়ান হস্তলিপি, যার নাম Linear B, কিন্তু তা ঠিক 'লিখন' (বা writing)-এ ব্যবহৃত হত কি না এবং মাধ্যম হিসেবে লিখনের বিস্তার তখন কতটা ছিল সেসব নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিরাট দ্বিমত রয়েছে। যা হোক, ৭৭৬-৭০০ সালের দিকে ফিনিশিয়ান বর্ণমালার এক আদি রূপ আসে, এবং গবেষকদের বিশ্বাস যে এ সময়েই শুরু হয়ে যায় হোমারের এই স্মৃতিনির্ভর মহাকাব্যদুটির প্যাপিরাস কাগজে লিখে ফেলা। পরে খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালের দিকে আলেকজান্দ্রিয়ান টেক্সটে (Alexandrian Vulgate) লিখে ফেলা হল এ দুই মহাকাব্য। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারিকেরা অনেক গবেষণা ও যাচাই-বাছাইয়ের পরে দাঁড় করালেন এ দুই মহাকাব্যের নতুন দুটি রূপ যেগুলো আমাদের হাতে থাকা বর্তমান *ইলিয়াড* ও *অডিসি*-র খুবই কাছাকাছি কিছু। ঠিক এ-

সময়েই এ দুই মহাকাব্য বিন্যস্ত হল চব্বিশটি করে পর্বে, পর্বগুলির শিরোনাম হিসেবে দেওয়া হল গ্রিক বর্ণমালার এক একটি করে বর্ণ। জেনোডোটাস, আরিস্তোফানেস ও অ্যারিস্টারকাস নামের তিন আলেকজান্দ্রিয়ান হোমারবিদ শুধু যে মহাকাব্যদুটোর আধুনিক রূপটা দিলেন এবং মিশরের প্যাপিরাসে তাদেরকে লিপিবদ্ধ করলেন, তা-ই নয়; সেইসঙ্গে তারা তাদের পৃষ্ঠাগুলোর মার্জিনে লিখে রাখলেন অমূল্য সব টীকা, ভাষ্য, ব্যাখ্যা, বিবৃতি, যাদেরকে সম্মিলিতভাবে বলা হয় scholia (স্কলাইয়া)। এসব স্কলাইয়ার মধ্যে অ্যারিস্টারকাসের লেখা স্কলাইয়াগুলোর বড় অংশ আজও টিকে আছে। অ্যারিস্টারকাস আরও একটি বড় কাজ করেন: তিনি দু মহাকাব্য থেকেই বেশ কিছু পঙ্‌ক্তি ঝেড়ে ফেলে দেন সেগুলো হোমার-উত্তরকালের চারণকবি বা রাজকবিদের যার যার স্বার্থসংশ্লিষ্ট সংযোজন ছিল, এই সিদ্ধান্তে এসে। এ-সময় থেকেই (খ্রিস্টপূর্ব ২২০ থেকে ১৫০ সাল) *ইলিয়াড*-এর লাইনসংখ্যা ১৫,৬৯৩ এবং অডিসি-র ১২,১০৬।

অ্যারিস্টারকাসের এই বিশাল কাজটির প্রায় বারো শ বছর পরে (৯৫০ খ্রিস্টাব্দে) তৈরি হল *ইলিয়াড*-এর সবচেয়ে বিখ্যাত প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ভেনেটাস-এ (Venetus A)। অ্যারিস্টারকাস ও আলেকজান্দ্রিয়ার গবেষকদের স্কলাইয়াগুলো, আগেই যেমন বলেছি, পুরোপুরি আমাদের হস্তগত হয়নি কোনোদিন। এদের বদলে আমাদের হাতে ভেনেটাস-এ-ই আছে প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি হিসেবে। ১৭৮৮ সালে ফরাসি গবেষক ভিলোইসঁ প্রথমবারের মতো লোকচক্ষুর অন্তরালের এই ভেনেটাস-এ পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করলেন, আর সেইসঙ্গে শুরু হয়ে গেল আধুনিক হোমার-গবেষণার যুগ।

এর মাত্র সাত বছরের মাথায় জার্মান পণ্ডিত ফ্রেডেরিখ অগাস্ট উলফ্ লিখলেন তাঁর *Prolegomena ad Homerum* ('হোমারে প্রবেশিকা') এবং আধুনিক যুগে প্রথমবারের মতো উসকে দিলেন হোমেরিক কোশ্চেনগুলো: কে হোমার? মানুষের মুখে মুখে, স্মৃতির ওপর ভর করে টিকে থাকা এ দুই দীর্ঘ মহাকাব্যের লিখিত টেক্সট কতটা মূলানুগ আর কতটা শিক্ষিত মানুষদের রুচিবোধের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত? আদি হোমারের আদি মহাকাব্যদুটি কি ভেনেটাস-এ পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মেলে বা মিলতে পারে, যেখানে প্রথমটার স্রষ্টা ভিক্ষা করে বেড়ানো চারণকবিরা, আর দ্বিতীয়টার আলেকজান্দ্রিয়ান শিক্ষিত গবেষকেরা? উলফ্-এর গবেষণা-উদ্ভূত এই বিতর্ক থেকেই জন্ম হলো দুই ভিন্নধারার হোমারবিদদের: একদিকে অ্যানালিস্টরা (Analyst) যারা বলেন, এ দুই মহাকাব্য কোনো একক মানুষের কাজ নয়, হোমার নামের মানুষটি স্রেফ মিথ বা চারণকবিতার ঐতিহ্যেরই প্রতীকী এক নাম; অন্যদিকে ইউনিটারিয়ানরা (Unitarian) যাদের মতে এ-দুই মহাকাব্য দীর্ঘ শতাব্দীর বাচনিক গাথার কংকালের ওপর দাঁড়ানো অবশ্যই, কিন্তু সেই কংকালদুটোকে একজন মানুষের একটা মাথাই এর বর্তমান রূপটি দিয়েছে, অর্থাৎ এ মহাকাব্যদুটোর ভেতরকার সংহতি, রেফারেন্স, ক্রস-রেফারেন্স, শব্দচয়ন, প্রকরণশৈলী এতখানিই একত্র আসঞ্জনশীল (coherent) যে এরা একের অধিক কবির সৃষ্টি, এমনটা হওয়া সম্ভবই নয়।

উলফের বিতর্কের পঁচাত্তর বছর পরে, ১৮৭০ সালে, ধনাঢ্য জার্মান ব্যবসায়ী হেইনরিখ শ্লিয়েমান আধুনিক তুরস্কের ঈজিয়ান সাগর উপকূলের হিসারলিকে 'ট্রয় প্রোজেক্ট'

নামের বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক খনন শুরু করলেন। তাঁর বারো বছর খননের পরে বিশ্ববাসী সাক্ষাৎ পেল অনেকগুলো ট্রয় নগরীর এবং রাজা প্রায়ামের অনেক সম্পদের। তবে শ্লিয়েমানের খননের এই উপসংহার নিয়ে বিতর্ক আজও আছে।

মধ্যযুগে যখন ছাপাখানার উদ্ভাবন হল তখন হোমারের মহাকাব্যদুটিই ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে একেবারে প্রথমদিককার ছাপা হওয়া কয়েকটি বইয়ের অন্যতম। ১৪৮৮ সালে ইতালিতে, গ্রিকভাষায়, প্রথম বের হল ছাপার অক্ষরে হোমার। আর ১৯০২ সালে এসে, আরও আধুনিক গবেষণা উপাদানের সুযোগ সুবিধা নিয়ে, প্রতিষ্ঠিত হল *ইলিয়াড* ও *অডিসি*-র চূড়ান্ততম গ্রিক পাণ্ডুলিপি, যার নাম হয়ে গেল 'অক্সফোর্ড ক্লাসিক্যাল টেক্সট'। ডি. বি. মনরো ও টি. ডব্লু. অ্যালেনের দাঁড় করানো এই টেক্সটটিই অধিকাংশ ইংরেজি অনুবাদের মতো আমাদের হাতের এই বাংলা অনুবাদেরও ভিত্তি।

বিংশ শতাব্দীতেই, 'অক্সফোর্ড ক্লাসিক্যাল গ্রিক টেক্সট' প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি, ঘটল হোমার-গবেষণায় আরেকটি বড় ঘটনা। ১৯৩৩-১৯৩৫ সালে আমেরিকান গবেষক মিলম্যান প্যারি ও অ্যালবার্ট বি. লর্ড অধুনালুপ্ত যুগোশ্লাভিয়ার চারণকবিদের ওপরে গবেষণার পরে জানালেন যে, হোমারের কবিতা চারিত্রে মৌখিক বা বাচনিক কবিতা (oral poetry), এবং সেইসঙ্গে চারণকবিরা কীভাবে তাদের স্মৃতির ভাণ্ডারে থাকা ফরমুলা বা গৎবাঁধা শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য নিয়ে এসব কবিতা আবৃত্তি করে থাকেন তা-ও দেখালেন এঁরা দুজন।

১৫৯৮ সালে জর্জ চ্যাপম্যান প্রথম ইংরেজিতে *ইলিয়াড* অনুবাদ করার পরে আজ পর্যন্ত এর প্রায় ৩১৫টি অনুবাদ হয়েছে ইংরেজি ভাষায়। হোমারের দুটি মহাকাব্যেরই কাব্যানুবাদ করেছেন দার্শনিক টমাস হবস্ থেকে নিয়ে আলেকজান্ডার পোপ, এ. টি. মারে থেকে বর্তমানকালের রবার্ট ফ্যাগলস্ পর্যন্ত অনেকেই। আর এর গদ্য অনুবাদও হয়েছে বেশ কটা, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ল্যাঙ-লিফ-মায়ার্স (Andrew Lang, Walter Leaf, Ernest Myers), স্যামুয়েল বাটলার ও ই. ভি. রিউয়েরটি। মূলের প্রতি বিশ্বস্ততার নিরিখে আজ পর্যন্ত তালিকার সবচেয়ে উপরে আছে তিন ইংরেজি অনুবাদ, তিনটিই কাব্যে: এ. টি. মারে, রিচমন্ড ল্যাটিমোর ও অ্যান্থনি ভেরিটি। 'অক্সফোর্ড ক্লাসিক্যাল গ্রিক টেক্সট'-এর পাশাপাশি এ তিনটি আক্ষরিক অনুবাদকেই অনুসরণ করা হয়েছে *ইলিয়াড*-এর এই বাংলা অনুবাদে।

ইলিয়াড পাঠের আনন্দ লাভের পূর্বশর্ত

ইলিয়াড এক বিকল্প পৃথিবী। এক সম্পূর্ণ পৃথিবী সেটা— মানুষ, দেবদেবী, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার, জাতিরাষ্ট্রগুলোর মধ্যেকার রেষারেষি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মানুষের অভিলাষ ও দেবতাদের পরিকল্পনা, এ সবকিছু নিয়ে নিজেই এক সম্পূর্ণ আকার-আয়তন-চেতনা বিশিষ্ট জগৎ এই *ইলিয়াড*। আর সে জগৎটি, কালিক দূরত্বের বিচারে, আমাদেরটার তিন হাজার বছর আগের এক জগৎ বলেই আমাদের কাছে তা আরও বেশি হতবুদ্ধিকর। *ইলিয়াড*-এর অনেক প্রশ্ন আছে যার উত্তর হোমারের সময়ের মানুষদের জানা ছিল অবশ্যই, কিন্তু আমাদের জানা নেই, থাকা সম্ভবও নয়। যেমন: মানুষের পৃথিবীতে দেবতারা কী করছিল? এত নগর-রাষ্ট্রের এত এত যোদ্ধাবাহিনী কেন ট্রয়ে গিয়েছিল রাজা আগামেমননের এক পারিবারিক প্রতিহিংসার সমর্থনদাতা ও সঙ্গী হতে? ট্রোজান যুবরাজ প্যারিসের হেলেন

অপহরণ পর্বের আবার কোনো পৌরাণিক ভিত্তি থাকে কী করে? কীভাবে সম্ভব যে নশ্বর অ্যাকিলিসের মা এক অবিনশ্বর দেবী? কোথায় পুরাণের শেষ আর নশ্বর মানুষের বাস্তবতার শুরু? কী করে বুঝব যে হোমার কখন, কোথায় কৌতুকচ্ছলে কথা বলছেন, যদি আমরা না-ই জানি যে তিনি কি বন্য-বর্বর-অশিক্ষিত ছিলেন নাকি ছিলেন দুঃখবাদী এক সাধুপুরুষ? বীরদের সেই যুগে অ্যাকিলিসের হঠাৎ 'বীরের ধর্ম'কে প্রশ্ন করে বসার, নশ্বরতার সাপেক্ষে মানুষের বীরত্বের অর্থহীনতার মর্মটি তুলে ধরার কী অর্থ হয়?

হোমারের মানুষদের অচেনা মনোজগৎ আর তাতে দেবদেবী ও পুরাণের এরকম মিলেমিশে থাকার ব্যাপারটি ইতিহাস-সময়-ভূগোল ও সাহিত্যের কালগত দূরত্বের নিরিখে আমাদের কাছে এরই মধ্যে অনেক জটিল ও হতবুদ্ধিকর এক *ইলিয়াড*কে যে আরও জটিল করে তোলে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অতএব *ইলিয়াড* পাঠের আনন্দ নেবার জন্য *ইলিয়াড* খুলে বসে পড়লেই আমাদের চলে না, তার আগে এ মহাকাব্যের ঐতিহাসিক, কালিক ও পৌরাণিক ভিত্তিগুলো প্রসঙ্গে যথাসম্ভব জ্ঞান রাখতেই হয়। হোমারকে বোঝার স্বার্থে হোমারের সেই 'সম্পূর্ণ' পৃথিবীর পশ্চাৎপট বিষয়ক এসব জ্ঞান থাকাটা অত্যাবশ্যক। সেগুলো কিছুটা বুঝে নিলেই দেখা যায় *ইলিয়াড*-এর কোনোকিছুই আর কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। এর অন্যতম কারণ, *ইলিয়াডে* যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের ওসব রক্তাক্ত মৃত্যু আর বীরদের স্বগতোক্তিগুলোর পেছনে যে নৈতিক উভয়সংকট (moral dilemma) কাজ করে, সেই একই নৈতিক ধাঁধা আমাদের এই সময়ের পৃথিবীর মানুষদের মধ্যেও, আজও, জীবনের সর্বস্তরেই বিদ্যমান রয়ে গেছে। ভালো আজও ভালোই, আর মন্দ আজও মন্দই; সত্য ও মিথ্যার গড় রূপটার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। নৈতিকতার নিখুঁত মাপকাঠিতে হোমারের পৃথিবী আমাদেরটার থেকে অনেক দূরের, অনেক অদ্ভুত এক পৃথিবী বটে সেটা। সেখানে কোনো বীর যেভাবে বীরত্ব অর্জনের জন্য মানুষ খুন করতে পারে, আমাদের আজকের আইন ও সামাজিক রীতি কাউকে সেভাবে তা করতে দেয় না। কিন্তু আমাদের পৃথিবীতেও যুদ্ধ এখনও একটি নিয়ত সত্য হিসেবে রয়ে গেছে বলেই আমরা হোমারের 'বীরের ধর্ম' বিষয়ক নৈতিকতার বিধিমালা ওভাবে আর না মানলেও, তাকে ঠিকই চিনতে পারি। যুদ্ধের পাশাপাশি *ইলিয়াড*-এর আর বাকি যে সত্যগুলো, যেমন অনৈতিক যৌনাকাঙ্ক্ষা, প্রতিশোধপরায়ণতা, নারী ও বৃদ্ধদের করুণ অবস্থা, সবার সেরা হওয়ার নিয়ত প্রতিযোগিতা, নেতৃত্বের ভুল, গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে মানুষের প্রায়শই ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া, মানুষের ভেতরকার অহমিকা-দম্ভ-গর্ব, ইত্যাদি সবই কমবেশি আমাদের কালের মানুষদের জন্যও প্রযোজ্য থেকে গেছে। একথা বলা ভুল হবে না যে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে, এই আধুনিক কালেও, বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড *ইলিয়াড* ঘটে চলেছে আজও। অর্থাৎ *ইলিয়াড*-এর তিন হাজার বছর আগেকার পৌরাণিক পৃথিবী আমাদের যতটা অচেনা, ততটাই চেনা সে পৃথিবীর মানুষদের নিত্যদিনকার কার্যকলাপ। চেনা ও অচেনার এই মিশেলের কারণেই হোমার একদিকে আমাদের কাছে অসম্ভব চিত্তাকর্ষক, অন্যদিকে তার অচেনা অংশটা এতই বড় যে, তিনি শেষবিচারেও জটিল, কঠিন ও হতবুদ্ধিকর। আর এর সঙ্গে তো সেই পৃথিবীর বিশাল ব্যাপ্তির বিষয়টা আছেই। অসংখ্য চরিত্র *ইলিয়াড*-এ; দেবদেবী, মানুষ ও স্থানের নাম মিলে হাজারের অনেক ওপরে নাম, যেখানে শুধু যুদ্ধে মারা যাওয়া লোকের নামই রয়েছে ২৪৩টি। আমাদের

সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতার নিরিখে এ ২৪৩-ই তো অনেক বড় এক সংখ্যা, হাজারের ওপরের বিচিত্র নামের সব মানুষ ও অদ্ভুত নামের সব স্থানের কথা না হয় বাদই দিলাম।

এই 'অচেনা' জগতের 'বিশাল ব্যাপ্তি' সংক্রান্ত সমস্যাটির সঙ্গে আবার রয়েছে ভাষার সমস্যা। হোমারের ভাষা সত্যিই বড় অদ্ভুত। বলা হয়ে থাকে, হোমার পাঠ করা সহজ, কিন্তু সেটা এ-কারণেই যে তার *ইলিয়াড*-এ একই কথাগুলোর, একই দীর্ঘ প্যারাগ্রাফগুলোর পুনরাবৃত্তি আছে বহুবার। অর্থাৎ ভাষার কারণে হোমার পাঠ সহজ এমন দাবি কেউ করেননি কোনোদিন। মূল হোমারে গড়ে প্রতি নয় লাইন পরপর দেখা গেছে একেকটি শব্দ এসেছে যে শব্দগুলো পরে আর আসেনি কখনোই— না হোমারে, না পরবর্তীকালের কোনো গ্রিক লেখায়। আর তার ওপর আছে জটিল এক ছন্দ যার নাম 'dactylic hexameter'। এই ছন্দের নিয়মানুযায়ী তার প্রতিটি পঙ্ক্তির আছে ছয়টি করে ভাগ, যার প্রতি ভাগে আবার তিন সিলেবল— একটি বড় ও দুটি ছোট। 'ড্যাকটাইলিক' এসেছে গ্রিক শব্দ daktylos থেকে যার অর্থ আঙুল, আর আঙুলের যেমন আছে কর বা জোড়া, এ ছন্দেরও তেমন— একটি বড় জোড়া, দুটি ছোট জোড়া। প্রতিটি পঙ্ক্তিতে আঙুলসদৃশ এই ছয় ইউনিটের শেষের জোড়াটি আবার সবসময়েই বড়-বড়, কারণ সম্ভবত এটাই যে কবি পঙ্ক্তির শেষটা চারিয়ে অনুভব করতে চাইতেন। জটিল সব কথাবার্তা! পাঠকদের শুধু এটুকু জানলেও চলবে যে, গ্রিক ভাষা প্রকৃতিগতভাবেই 'iambic' (দ্বিমাত্রিক পর্বের, যার প্রথম অক্ষর ছোট ও ঝোঁকহীন, আর দ্বিতীয় অক্ষর বড় ও ঝোঁকপূর্ণ) যেখানে ছোট একটা স্পন্দন বা ধ্বনির পরেই থাকে বড় আরেকটা। তাই ভাবলে ধাঁধার মতো লাগে যে হোমার দ্বিমাত্রিক পর্বের ছন্দের বিপরীতে তার এই অদ্ভুত ছয়পর্বের ছন্দ পেলেন কোথায়? হোমারের 'dactylic hexameter' গ্রিক ভাষার প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক ছন্দের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলেই পাঠকের হোমার পাঠকালীন জটিলতা আরও বেড়ে যায়। আর এটাই হোমারে পাওয়া নানা বিভ্রান্তিজনক ও অদেখা, অজানা ব্যাকরণগত সমস্যার উৎসমুখ। তবে হোমারের ছন্দ ও মাত্রার এই বিশ্লেষণ, অতি অবশ্যই, এর লিখিত টেক্সটের ওপর ভিত্তি করে করা। ওরাল পোয়েট হিসেবে হোমার— যিনি তাঁর সৃষ্টিটি করেছেন লেখনীর সাহায্য ছাড়া—নিজে নিশ্চয় কানে শুনে অনুভব করার বাইরে আর কিছু জানতেন না তাঁর ছন্দ ও মাত্রা সম্বন্ধে।

টি. ই. লরেন্স বলেছিলেন, হোমারের গ্রিক শব্দের অর্থ নিয়ে আপনার মুক্তি মিলবে না কোনোদিনই। শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে শৃঙ্খল ও মুক্তির এই রূপকার্থবাহী কথাটা তিনি বলেছিলেন এ-কারণেই যে, এ মহাজটিল হোমারই আবার তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্য ও আভিজাত্য দিয়ে আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ ও বন্দি করে রাখেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, আমাদের বাধ্য করেন তাঁর সৃষ্টির প্রতি আনুগত্য প্রকাশে। যা-হোক, দীর্ঘ এই 'ভূমিকা' অংশের অবতারণা জটিল ছন্দ ও ভাষার হোমারের জটিল *ইলিয়াড*কে যতটা পারা যায় পাঠকবান্ধব করার স্বপ্ন মাথায় রেখেই। *ইলিয়াড* বোঝার পথে সাধারণ পাঠকের জন্য প্রাথমিক বড় বাধা যেহেতু এর পৌরাণিক ভিত্তির বিষয়টুকু, সেহেতু প্রথমে আমরা আলোচনা করব সেই পুরাণ নিয়েই।

ইলিয়াড-এর আগে ও পরে: 'ট্রোজান মহাকাব্য চক্র'

ইলিয়াড-এর মানবিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি এটুকুই যে গ্রিক জাতির লোকেরা এখানে তাদের রানি হেলেনকে অপহরণের প্রতিশোধ নিতে, কিংবা সেই অজুহাতে পার্শ্ববর্তী আনাতোলিয়ান ট্রোয়াড অঞ্চলে সাম্রাজ্য ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, দশ বছর ধরে এক যুদ্ধ চালায়, ইতিহাসে যার নাম 'ট্রোজান যুদ্ধ', যে যুদ্ধের পরিণতিতে বিলুপ্ত হয়ে যায় রাজা প্রায়ামের প্রাচীন এ শহরটি, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় পুরো একটি জাতি (যাদের জাতিগত নাম ছিল 'ট্রোজান')। আর এর পৌরাণিক (mythical) ভিত্তি আমাদের কাছে আবার একই ঘটনার ব্যাখ্যা খাড়া করে গ্রিক পুরাণের আলোকে—দেবদেবীদের এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণ ও এই যুদ্ধ-পরবর্তী ক্রিয়াকলাপের নিরিখে।

ট্রোজান যুদ্ধের পুরো গল্পটি, আগেই বলেছি, ইলিয়াড-এ নেই। *ইলিয়াড* দশ বছরব্যাপী যুদ্ধের শেষদিকের মাত্র পঞ্চাশ দিনের এক আখ্যান, এবং অ্যাকিলিসের মৃত্যু, ট্রয়ের পতন, গ্রিকদের চূড়ান্ত বিজয় বা বিখ্যাত 'ট্রোজান হর্স'— সবই *ইলিয়াড*-এ অনুপস্থিত। পুরো গল্পটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জানতে, সেইসঙ্গে ট্রোজান যুদ্ধের শেষে অন্যদের ভাগ্যে কী কী ঘটেছিল তা বুঝতে আমাদের অবশ্যই যেতে হবে আটটি (মতান্তরে বারোটি) মহাকাব্যিক আখ্যানের কাছে, যেগুলোর সম্মিলিত নাম 'ট্রোজান মহাকাব্য চক্র' (Trojan Epic Cycle)। হোমারের *ইলিয়াড* ও *অডিসি* এই আট বা বারোটি মহাকাব্যেরই দুটি। গবেষকদের অনুমান, এই 'মহাকাব্য চক্র' গাঁথা হয় খ্রিস্টপূর্ব আট শ থেকে ছয় শ শতকের দিকে, অর্থাৎ মোটামুটি হোমারের জীবনকালেই বা তার কিছু পরে। *ইলিয়াড* ও *অডিসি* ছাড়া এই চক্রের বাকি মহাকাব্যগুলো হয় নিখোঁজ, না হয় টিকে আছে সামান্য কিছু খণ্ডাংশে। প্রোক্লাস (Proclus) নামের এক ব্যক্তি এগুলো একত্রে জড় করেন। বর্তমান গবেষকদের ধারণা, এই প্রোক্লাস ছিল দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের রোমান সম্রাট মারকাস অরেলিয়াসের শিক্ষক ও এক নামকরা ব্যাকরণবিদ। হতে পারে *ইলিয়াড* ও *অডিসি*র মধ্যে হোমার ট্রোজান যুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ক যে বীজ বুনে রেখে গিয়েছিলেন তা-ই পরে ডালপালা ছড়িয়েছে এই মহাকাব্য চক্রের বাকিগুলোতে, আর তাই আমরা এতে পরিষ্কারভাবে পাই ট্রোজান যুদ্ধের কারণের কথা, জানতে পারি যে মূল যুদ্ধের আগে গ্রিকরা ট্রয় দখলের আরেকটা ব্যর্থ চেষ্টাও করেছিল, এবং আরও জানি কীভাবে, কার বুদ্ধিতে তৈরি হয়েছিল ট্রয়ের ঘোড়া আর কীভাবে তা ইতি টেনেছিল এই যুদ্ধের। নিচে থাকল এই চক্রের মহাকাব্যগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

সিপ্রিয়া (The Cypria)

ট্রোজান মহাকাব্য চক্রের প্রথমটি *সিপ্রিয়া*, যাতে রয়েছে ট্রোজান যুদ্ধের আগের সব গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী এবং *ইলিয়াড* শুরু হওয়ার আগের নয় বছরের যুদ্ধের কথা। *সিপ্রিয়া*-র শুরুতেই, প্রোক্লাসের সারসংক্ষেপ থেকে, আমরা জানতে পারি যে দেবরাজ জিউস—এক অজ্ঞাত কারণে—মনস্থির করেছে যে সে ট্রোজান যুদ্ধ বাধাবে। এ উদ্দেশ্য মাথায় রেখেই জিউস

নশ্বর রাজা পেলিউস ও সমুদ্রদেবী থেটিসের বিয়েতে পাঠাল দ্বন্দ্ব-কলহের দেবী এরিসকে (Eris)। এই পেলিউস ও থেটিসই পরে জন্ম দেবে গ্রিক বীর অ্যাকিলিসের। তাদের এই বিয়ের অনুষ্ঠানে ঝামেলা বাধিয়ে দিল এরিস। সে একটা বিতর্ক উসকে দিল ভয়ংকর এক বিষয় নিয়েঃ দেবী হেরা, দেবী অ্যাথিনা ও দেবী আফ্রোদিতির মধ্যে কে সবচেয়ে সুন্দরী? এরিস উপস্থিত অতিথিদের দিকে ছুড়ে মারল এক সোনার আপেল, যার গায়ে লেখা 'সবচেয়ে রূপসী দেবীর জন্য'। ওদিকে তিন দেবীর প্রত্যেকেই নিজেকে ভাবছে যে সে-ই শ্রেষ্ঠতম সুন্দরী, অতএব তারা নিজেদের মধ্যে মিটিয়েও নিতে পারছে না এই বিতর্ক। সেসময় জিউস তার দূত হারমিসকে পাঠাল এই তিন দেবীকে ট্রোয়াড অঞ্চলের আইডা পর্বতের ঢালে নিয়ে যেতে। ওখানেই তখন মেষ চরাচ্ছিল এক তরুণ, নাম তার প্যারিস।

*সিপ্রিয়া*তে বলা আছে যে এই তরুণের নাম ছিল আলেকজান্ডার, কিন্তু আমরা এখন তাকে প্যারিস নামেই চিনি। হয়তো হোমার-পরবর্তী কালের বিখ্যাত আলেকজান্ডার দি গ্রেট-এর সঙ্গে পাঠক যেন তাকে গুলিয়ে না ফেলেন, তাই তার এই নতুন নামের (প্যারিস) উদ্ভব। হোমারের মূল *ইলিয়াড*-এ অবশ্য তার নাম দেখা যায় দুটিই—প্যারিস ও আলেকজান্ডার। যাই হোক, *সিপ্রিয়া*-তে আমাদের বলা হয় যে এই প্যারিস 'নশ্বর মানুষদের মাঝে দেখতে সবচেয়ে সুন্দর।' এবার দেবীদের অনুরোধে প্যারিস রাজি হল তিনজনের সৌন্দর্য বিচার করে রায় দিতে যে, কে সবচেয়ে বেশি সুন্দরী। এটাই আজ আমাদের কাছে পরিচিত বিখ্যাত 'প্যারিসের রায়' নামে ('Judgement of Paris')।

এই প্যারিস ছিল ট্রয়ের রাজা প্রায়াম ও রানি হেকুবার পুত্র, কিন্তু তাকে শিশু বয়সেই তার পিতা রাজপ্রাসাদ থেকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয় পিতা প্রায়ামের দেখা এক অমঙ্গলসূচক স্বপ্নের কারণে। প্রায়াম স্বপ্নে দেখেছিল যে, হেকুবার গর্ভে যে ছেলেটির জন্ম হয়েছে সে কোনো মানুষ নয় বরং আগুনজ্বলা সাপদের নিয়ে তৈরি এক অগ্নিমশাল, আর এই মশালের থেকে স্ফুলিঙ্গ ছুটে গিয়ে পরে ট্রয়ের নগর-দেওয়ালের চারপাশের উঁচু ঘাসে আগুন ধরে গেল এবং পুড়ে খাক হল পুরো ট্রয়। প্রায়ামের এই দুঃস্বপ্নের সঙ্গে পরে আমরা মিল খুঁজে পাব বাস্তবেরঃ প্যারিসই হেলেনকে অপহরণ করে ট্রোজান যুদ্ধ বাধানোর পেছনে মূল কারণ হয়ে থাকবে এবং একদিন সত্যিই গ্রিকরা ট্রয়নগর দখল করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেবে। যা হোক, প্রায়ামের এই দুঃস্বপ্নের কারণেই প্যারিসকে জঙ্গলে নির্বাসন দেওয়া হল যাতে করে সে মারা যায়। প্রায়ামের রাখাল তাকে আইডা পর্বতে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে দিল এক ভাল্লুক। পরে ওই রাখালই শিশু প্যারিসকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গোপনে লালন-পালন করতে থাকে।

প্যারিস যখন তার রায়টি জানায়, তখনও সে কিন্তু জানে না যে সে প্রায়ামের রাজবংশেরই একজন। এ-ঘটনার অনেক পরে সে ট্রয়ে ফিরে যায়, নিজের সঠিক পরিচয় খুঁজে পায় এবং পিতা, মাতা ও পরিবারের সঙ্গে যোগ দেয়। (হতে পারে, এজন্যই প্যারিসের নাম দুটিঃ একটি ওই রাখালের দেওয়া নাম, আর অন্যটি পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলনের পরের নাম; কিংবা হতে পারে আমরা এখানে দুই পৃথক পুরাণের সম্মিলন দেখছি, যেখানে একটিতে নায়কের নাম ছিল প্যারিস, অন্যটিতে আলেকজান্ডার)।

প্যারিস, *সিপ্রিয়া* মোতাবেক, যখন রায়টি নিয়ে ভাবছে, তখন তিন দেবী তাকে তিনটি প্রলোভন দেয়। অ্যাথিনা জানায়, প্যারিস যদি অ্যাথিনাকে শ্রেষ্ঠতম সুন্দরী বলে, তাহলে অ্যাথিনা প্যারিসকে দেবে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা; হেরা বলে, সে তাকে দেবে ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা; আর আফ্রোদিতি বলে সে প্যারিসকে উপহার দেবে পৃথিবীর সুন্দরীতমা নারী, স্পার্টার রানি হেলেনকে। প্যারিস আফ্রোদিতির প্রস্তাবিত উৎকোচকেই নিজের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও লোভনীয় বলে মনে করল। হেলেনকে বিয়ে করার লোভে তাই সে রায় দিয়ে দিল দেবী আফ্রোদিতির পক্ষে।

এরপরেই *সিপ্রিয়া* চলে যায় প্যারিসের সঙ্গে তার পরিবারের পুনর্মিলনের কাহিনী বর্ণনায়, যার শেষে প্যারিস হেলেনের সন্ধানে ঈজিয়ান সাগর পাড়ি দিয়ে যাত্রা করে গ্রিসের মূল ভূখণ্ডের দিকে। ট্রয়ের যুবরাজকে নিজেদের প্রাসাদে স্বাগত জানায় স্পার্টার রাজা মেনেলাস ও তার সুন্দরী স্ত্রী হেলেন।

হয় মেনেলাস মানুষকে বেশি বিশ্বাস করত, না হয় সে ছিল একটু ভোঁতাবুদ্ধির, কারণ প্যারিসের উপস্থিতিতেই সে তার সুন্দরী স্ত্রীকে এই সুদর্শন যুবকের সান্নিধ্যে রেখে স্পার্টা ছেড়ে যাত্রা করে ক্রিট দ্বীপের উদ্দেশে। এই ফাঁকে দেবী আফ্রোদিতি এসে হেলেন ও প্যারিসের মিলন ঘটিয়ে দিলে, তারা প্রচুর ধনসম্পদ জাহাজে তুলে রাতের অন্ধকারে পাড়ি জমায় ট্রয়ের পথে। গ্রিকরা সবসময় বলে যে হেলেন অপহৃত হয়েছিল, আর ট্রোজানরা দাবি করে সে স্বেচ্ছায় স্বামী মেনেলাসকে ছেড়ে হাত ধরেছিল ভিনদেশি যুবরাজের; কিন্তু *সিপ্রিয়া* বলে, সে যা-ই করে থাকুক তা করেছিল দেবীর আজ্ঞাবলেই—সে ছিল প্যারিসকে দেওয়া আফ্রোদিতির প্রতিশ্রুতির পূরণ। অপহরণ হোক আর স্বেচ্ছায় ভেগে যাওয়া হোক, মেনেলাসের জন্য এটাই সত্য থেকে যায় যে প্যারিস 'অতিথির শর্ত' ভেঙেছে আতিথ্যকর্তার বউয়ের দিকে চোখ দিয়ে এবং তাকে কামনা করার মাধ্যমে। তাই তাকে শাস্তি দেবার জন্যই গ্রিকদের নানা নগর-রাষ্ট্রের নানা রাজাকে ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে রাজি করানোর সংকল্প গ্রহণ করে মেনেলাস।

সিপ্রিয়া অনুসারে হেলেন ও প্যারিস স্পার্টা থেকে সোজা ট্রয় চলে না গিয়ে আগে যায় বর্তমান লেবাননের সিডোন-এ (Sidon)। দেবী হেরা, তখনও রায়ের কারণে প্যারিসের ওপর ক্ষুব্ধ, তাদের জাহাজের পথ ঘুরিয়ে দিয়ে জাহাজ চালিত করে দেয় এই সিডোনের পথে। *ইলিয়াডেই* তাদের এ সিডোন যাত্রার স্পষ্ট উল্লেখ আছে মহাকাব্যের ৬:২৮৯-২৯২ অংশে।

মেনেলাস যখন শুনল কী সর্বনাশ ঘটে গেছে, সে ক্রিট থেকে স্পার্টায় ফিরেই তার বড় ভাই মাইসিনির রাজা আগামেমননের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল ট্রয়ের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে যাওয়ার। তার উদ্দেশ্য ছিল দুটো: হেলেনকে ফিরিয়ে আনা; এবং ট্রয় শহরকেই, তাদের যুবরাজের পাপের শাস্তি হিসেবে, গুঁড়িয়ে দেওয়া। এবার মেনেলাস পুরো গ্রিস ভূখণ্ড জুড়ে শুরু করল যুদ্ধের জন্য অধিনায়ক ও সৈন্য সংগ্রহ করা। প্রথমে সে রাজি করাল পাইলোসের রাজা নেস্টরকে, পরে ইথাকার অডিসিয়ুসকেও। অডিসিয়ুস শুরুতে এই যুদ্ধে যোগ দিতে চায়নি, সে পাগলের ভান করে যুদ্ধ এড়াতে চেয়েছিল। *সিপ্রিয়া* অন্য গ্রিক রাজাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণে সম্মতি দেওয়ার বিষয়ে আর কিছু বলে না। তবে *ইলিয়াড*-এর

২য় পর্বে আমরা জেনে যাই যে, ৪৪ জন সেনা অধিনায়কের নেতৃত্বে মোট ২৯টি সৈন্যদল গ্রিসের মোট ১৭৫টি নগর-রাষ্ট্র বা রাজ্য থেকে সর্বমোট ১১৮৬টি জাহাজ নিয়ে ট্রয় অভিযানে নেমেছিল তাদের সর্বাধিনায়ক, মাইসিনির রাজা, আগামেমননের নেতৃত্বে। ট্রয় অভিযানে যাত্রা করা এই বিশাল বাহিনীর সর্বমোট সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ।

সিপ্রিয়া অনুসারে এই এতগুলো জাহাজ অবশেষে জড় হল মূল গ্রিক ভূখণ্ডের বিয়োশা রাজ্যের পূর্ব উপকূলে, আউলিস নামের এক বন্দরে, যেখানে গ্রিকরা দেবদেবীর প্রতি পুজো-উৎসর্গ শেষে রওনা দিল বহুদূরের ট্রয়ের পথে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তারা প্রথমে ট্রয়ে না পৌঁছে পৌঁছাল বরং ট্রয়ের দক্ষিণে, আনাতোলিয়ার মূল ভূখণ্ডের টিউথ্রানিয়া নামের এক স্থানে। টিউথ্রানিয়াকে ট্রয় ভেবে সেই শহর রীতিমতো গুঁড়িয়ে দিল গ্রিক সৈন্যবাহিনী। কিন্তু পরে তাদের ভুল বুঝতে পেরে তারা যখন ফের ট্রয়ের উদ্দেশে রওনা দেবে, তার আগেই এক প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের ধাক্কায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল তাদের এ বিশাল জাহাজবহর। এরপর তাদের সবার ফের আউলিসে একসঙ্গে জড় হয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ট্রয় অভিযানে নামতে লেগে গেল অতি দীর্ঘ এক সময়—নয়টি বছর। যুদ্ধযাত্রার শুরুতে নয় বছরের এই বিলম্বই ব্যাখ্যা দেয় কেন ট্রোজান যুদ্ধ ছিল মোট দশ বছরের এবং কেন এ যুদ্ধশেষের সামান্য কয়দিনের বিবরণ দিয়ে গড়া *ইলিয়াড*। এই ব্যাখ্যা মোতাবেক গ্রিকরা ট্রয়ের উপকূলে দশটা বছর পড়ে ছিল না, বরং সেখানে তারা ছিল মাত্র কয়েকটি দিন (সম্ভবত মাস তিনেক)। কিন্তু এর বিপরীতে, *ইলিয়াড* থেকেই নেওয়া, কিছু তথ্যপ্রমাণ আছে যা বলে যে গ্রিকরা দীর্ঘ অতগুলো বছর ট্রয়ের উপকূলেই শিবির গেড়ে ছিল এবং সেসময়টা তারা ট্রোয়াড অঞ্চলের অন্যান্য শহর ধ্বংস ও লুটতরাজ করার কাজে লাগিয়েছিল। *ইলিয়াড*-এ অ্যাকিলিস নিজেই দাবি করে যে সে ট্রোয়াড অঞ্চলের মোট তেইশটি শহর গুঁড়িয়ে দিয়েছে ট্রয়ে আসা থেকে *ইলিয়াড* শুরুর মাঝখানের দিনগুলোতে (৯:৩২৮-৩২৯)।

যা হোক, আউলিস বন্দর থেকে গ্রিকদের দ্বিতীয়বারের মতো ট্রয় অভিমুখে যাত্রার আগে ঘটে গেল কিছু ট্র্যাজিক ঘটনা। ট্রোজান পক্ষের দেবী আর্টেমিজ সেখানে এক প্রলয়ঙ্করী হাওয়া পাঠাল যেন গ্রিকদের যাত্রা বিলম্বিত হয়। তখন রাজা আগামেমনন এই দেবীকে শান্ত করবার জন্য তার নিজের মেয়ে আইফিগেনিয়াকে দেবীর পূজায় বলি দেবার সিদ্ধান্ত নিল। *সিপ্রিয়াতে* অবশ্য শেষ মুহূর্তে দেবী আর্টেমিজ আইফিগেনিয়াকে বলির বেদি থেকে তুলে নিয়ে যায়, তাকে অমর বানায়, আর তার স্থানে বেদিতে রাখে এক হরিণশাবক (যেমন হিব্রু বাইবেলের জেনেসিস ২২-এ আমরা দেখি আব্রাহাম তার ছেলে আইজ্যাককে খোদার নামে বলি দিতে যাবার সময়ে আইজ্যাকের বদলে, অলৌকিক শক্তির হস্তক্ষেপে, বলি হল এক ভেড়ার।)

এই আইফিগেনিয়া উপাখ্যানের পরে গ্রিকরা ট্রয়ের পথে আবার রওনা হয়ে প্রথমে পৌঁছাল টেনেডস্ দ্বীপে, তারপর লেম্‌নোসে, এবং শেষে আনাতোলিয়ান উপকূলে ট্রয় নগরের সমুদ্রসৈকতে। এবার তারা যে ঠিক জায়গাটিতে পৌঁছাল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যর্থ হল তাদের আক্রমণ, গ্রিকরা পিছু হটতে বাধ্য হল ট্রোজানদের শক্ত প্রতিরক্ষার মুখে। *সিপ্রিয়া* বলছে:

গ্রিকরা এবার ইলিয়ামে (ট্রয়ে) নামার চেষ্টা চালাল, কিন্তু ট্রোজানরা ঠেকিয়ে দিল তাদের। গ্রিক প্রোটেসিলেয়াস খুন হল ট্রোজান হেক্টরের হাতে...গ্রিকরা ট্রোজানদের কাছে দূত পাঠাল হেলেন ও হেলেনের সঙ্গে আনা সমস্ত সম্পদ ফিরিয়ে দেবার দাবি রেখে। ট্রোজানরা এইসব দাবি প্রত্যাখ্যান করলে গ্রিকরা প্রথমে ট্রয় নগর আক্রমণ করল এবং পরে ট্রয়ের চারপাশের সব গ্রাম ও শহর গুঁড়িয়ে দিতে লাগল। এরপরে অ্যাকিলিস চাইল যে হেলেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, তখন দেবী আফ্রোদিতি ও দেবী থেটিস [অ্যাকিলিসের মা] তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটানোর বুদ্ধি-পরামর্শ করল আর গ্রিকরা চাইল দেশে ফিরে যাবে, কিন্তু তাদেরকে বাধা দিল অ্যাকিলিস।...পরে অ্যাকিলিস গুঁড়িয়ে দিল লারনেসাস ও পেডাসাসসহ আশেপাশের আরও অনেক শহর, এবং হত্যা করল ট্রয়লাসকে [প্রায়ামের পুত্র, হেক্টরের ভাই)]।... অ্যাকিলিস এসব যুদ্ধলুটের মাল থেকে ব্রাইসিয়িস নামের এক মেয়েকে পেল গ্রিকবাহিনীর দেওয়া পুরস্কার হিসেবে, আর আগামেমনন পেল ক্রাইসিয়িস নামের এক মেয়েকে।...দেবরাজ জিউস তখন পরিকল্পনা করল অ্যাকিলিসকে গ্রিকবাহিনীর থেকে দূরে সরিয়ে রেখে ট্রোজানদের মুক্তি দেবে ধ্বংসের হাত থেকে।

এখানেই শেষ হল *সিপ্রিয়া*-র। মঞ্চ তৈরি হল মহাকাব্য চক্রের দ্বিতীয় মহাকাব্য *ইলিয়াড*-এর, যার প্রথম পর্বেই আমরা দেখব গ্রিক রাজা আগামেমনন ও গ্রিক সেরা যোদ্ধা অ্যাকিলিসের মধ্যে কলহ বেধে গেছে ক্রাইসিয়িস ও ব্রাইসিয়িস নামের ওই দুই নারীকে নিয়ে, যারা দুজনেই অ্যাকিলিসের গুঁড়িয়ে দেওয়া দুই শহর থেকে পাওয়া যুদ্ধের লুটের মাল।

ইলিয়াড (The Iliad)

ইলিয়াড নিয়ে বিস্তারিত বলার এখানে কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ এ বইয়ের প্রতিটি পর্ব শুরুর 'সারসংক্ষেপে' এবং 'পাঠ-পর্যালোচনা' অংশে সে বিষয়ে যথেষ্ট বলা হয়ে গেছে। *ইলিয়াড*-এর ঘটনাকাল ট্রোজান যুদ্ধের দশম বছরের শেষ কয়েকটি দিন। এর শেষ হয় গ্রিকদের হাতে ট্রয়ের পতনের অল্প কিছুদিন আগে। *ইলিয়াড*-এর শুরুতে আমরা দেখি অ্যাকিলিস আগামেমননের প্রতি ক্রোধোন্মাদ, কারণ রাজা আগামেমনন তার নিজের যুদ্ধে পাওয়া উপহার ক্রাইসিয়িস নামের মেয়েটিকে হারিয়ে অ্যাকিলিসের পাওয়া উপহার ব্রাইসিয়িস নামের মেয়েটিকে তার কাছ থেকে অসম্মানজনকভাবে কেড়ে নিয়েছে। অ্যাকিলিস এই ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত নিল ট্রোজান যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার। এর ফলে যুদ্ধে হারতে লাগল গ্রিকরা; এবং একসময় হেক্টর আগুন দিল গ্রিকদের একটি জাহাজে। গ্রিকরা এ-পর্যায়ে অ্যাকিলিসকে যুদ্ধে ফেরার মিনতি জানাল। রাজা আগামেমনন তার ভুল স্বীকার করে অ্যাকিলিসকে বিশাল ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রাখলে আবার যুদ্ধে ফিরে এল অ্যাকিলিস, তবে তা যতটা আগামেমননের প্রতি তার ক্রোধের ইতি হয়ে গেছে বলে, তার থেকে বেশি নিজের প্রিয়তম বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের ট্রোজান হেক্টরের হাতে নিহত হওয়ার ঘটনা উদ্ভূত প্রতিশোধপরায়ণতা থেকে। *ইলিয়াড*-এ অ্যাকিলিসের প্রথম

পর্যায়ের ক্রোধ আগামেমননের ওপরে, যার পরিণতিতে অ্যাকিলিস যুদ্ধে হারাল তার প্রিয়তম বন্ধুকে; আর তার দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্রোধটি বন্ধুর হত্যাকারী হেক্টরের ওপরে। অ্যাকিলিসের এ দুই পর্যায়ের দুই খুনে ক্রোধের গল্পই *ইলিয়াড*, যার শেষে গিয়ে ট্রোজানদের সেরা বীর হেক্টরকে খুন করে বন্ধুহত্যার প্রতিশোধ নেয় অ্যাকিলিস। মহাকাব্যটির শেষতম পর্বে হেক্টরের পিতা প্রায়াম অ্যাকিলিসকে রাজি করায় ছেলের লাশ ফিরিয়ে দিতে। নৃশংস বীর অ্যাকিলিসের মানবিকতার পরিচয় পাওয়ার মধ্য দিয়ে হেক্টরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখতে দেখতে আমরা শেষ করি *ইলিয়াড*। *ইলিয়াড*-এর শেষে প্রধান ট্রোজান বীর হেক্টর মৃত, কিন্তু ট্রয় নগর তখনও অক্ষত, হেক্টরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কারণে তখন স্রেফ এক সাময়িক যুদ্ধবিরতি চলছে গ্রিক ও ট্রোজানবাহিনীর মধ্যে।

ঈথিওপিস (The Aethiopis)

মহাকাব্য চক্রের তৃতীয়টি শুরু হয় *ইলিয়াড* যেখানে শেষ, ঠিক তার পরেই। এর রচয়িতা তুরস্কের পশ্চিম উপকূলের মিলেটাস শহরের আর্কটিনাস নামের এক কবি, এবং এর রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ সালের আগে-পরে কোনো এক সময়ে, অর্থাৎ হোমার বেঁচে থাকতেই, যদিও সে বিষয়ে কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দাঁড় করানো যায়নি। এর পর্বসংখ্যা মোট পাঁচ।

ঈথিওপিস-এর শুরু অ্যাকিলিসের হাতে আমাজন রানি (আমাজন প্রসঙ্গে দেখুন এ বইয়ের 'প্রধান চরিত্রসমূহ' অধ্যায়ের 'দেবদেবী' অংশটুকু) পেন্থেসিলেইয়ার হত্যার মধ্য দিয়ে। এর পর অ্যাকিলিস হত্যা করে মেমননকে, সে ট্রয়ের রাজা লাওমিডনের নাতি এবং ঈথিওপিয়ান এক যুবরাজ। লাওমিডন যেহেতু রাজা প্রায়ামের পিতা ছিল, তাই মেমনন প্রায়ামের ভ্রাতুষ্পুত্র, অর্থাৎ প্যারিস ও হেক্টরের চাচাতো ভাই। আমাজন রানি ও ঈথিওপিয়ান মেমনন, দুজনেই তাদের যার যার বাহিনীকে ট্রয়ে এনেছিল গ্রিক বনাম ট্রোজানদের যুদ্ধে ট্রোজানদের সহায়তা দেবে বলে।

এ-পর্যায়ে দেবতা অ্যাপোলোর সাহায্য নিয়ে ট্রোজান প্যারিস তীর মেরে হত্যা করে অ্যাকিলিসকে। হেক্টরকে খুন করলে যে অ্যাকিলিসের শীঘ্রমৃত্যু হবে, সে কথা বারবার বলা হয়েছিল *ইলিয়াড*-এ। *ঈথিওপিস*-এ যদিও অ্যাকিলিস হত্যার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ নেই, তবু আমরা অন্যান্য প্রাচীন উৎস থেকে (যেমন ওভিদ-এর *মেটামরফোসিস*১২:৫৮০-৬১৯) জানি যে প্যারিস অ্যাকিলিসের শরীরের একমাত্র নাজুক ও অরক্ষিত অংশে, তার গোড়ালিতে, তীর মেরে তাকে হত্যা করে। অ্যাকিলিসের জন্মের পর তার মা থেটিস তার শরীরকে যাবতীয় বিপদ থেকে চিরসুরক্ষা দিতে তাকে স্বর্গীয় স্টিক্স নদীর জলে চুবানোর সময় তার গোড়ালিটা ধরে রেখেছিল বলে অ্যাকিলিসের গোড়ালিতে স্টিক্সের জল লাগেনি, এবং সেই থেকেই ওটা তার শরীরের একমাত্র বিপদের কাছে উন্মুক্ত অংশ হিসেবে থেকে গিয়েছিল।

অ্যাকিলিসের মৃত্যুর পরে গ্রিকরা তার মৃতদেহ জাহাজবহরের কাছে নিয়ে আসে, তাকে চিতায় দাহ করে এবং তার সম্মানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্রীড়ানুষ্ঠানও আয়োজন করে। কিন্তু এই সব আয়োজন ম্লান করে দেয় দুই প্রধান গ্রিক বীর অডিসিয়ুস ও অ্যাজাক্সের মধ্যে

অ্যাকিলিসের ঢাল-বর্মের দখল কে পাবে তা নিয়ে শুরু হওয়া এক তীব্র দ্বন্দ্ব, যার মোচন ঘটবে মহাকাব্য চক্রের চতুর্থটিতে, যার নাম *লিটল্ ইলিয়াড*।

লিটল্ ইলিয়াড (The Little Iliad)

প্রোক্লাস আমাদের জানান যে *লিটল ইলিয়াড*-এর রচয়িতা ছিলেন লেস্‌বোস দ্বীপের মাইটিলিনি শহরের লেস্‌চেস নামের এক কবি, যিনি চারটি পর্বে এ মহাকাব্যটি গাঁথেন খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে। মহাকাব্যটির শুরু হয় অ্যাজাক্সের বিরুদ্ধে অডিসিয়ুসের জয়লাভের মধ্য দিয়ে। অডিসিয়ুসের হস্তগত হয় অ্যাকিলিসের বর্মসাজ, ঢাল ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র। অ্যাজাক্স সেই দুঃখে আত্মহত্যা করে (এ ঘটনা নিয়েই সফোক্লিস খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে তাঁর বিখ্যাত এক ট্র্যাজেডি লেখেন)। এরপর গ্রিকদের সঙ্গে ট্রোজানদের আবার যুদ্ধ শুরু হয়, দুপক্ষেই মারা যায় অনেকে। গ্রিক বীর ফিলোক্‌টিটেস (যাকে আমরা *ইলিয়াড*-এ দেখি ট্রয়ে আসার সময়ে সাপের কামড়ে আহত হয়ে লেমনোস্ দ্বীপে পড়ে রয়েছে) ট্রয়ে এসে যুদ্ধে যোগ দেয় এবং হত্যা করে ট্রোজান যুবরাজ, হেলেনের স্বামী, আর একইসঙ্গে অ্যাকিলিসের হত্যাকারী প্যারিসকে। প্যারিসের মৃত্যুর পরে এপিয়াস নামের এক অখ্যাত গ্রিক তৈরি করে বিখ্যাত সেই 'কাঠের ঘোড়া'। এপিয়াসকে এই কাঠের ঘোড়া তৈরির নির্দেশ দেয় দেবী অ্যাথিনা। ট্রোজান মহাকাব্য চক্রে এই প্রথম আমরা দেখি 'কাঠের ঘোড়া' বা 'ট্রোজান উডেন হর্স'-এর উল্লেখ।

লিটল ইলিয়াড মোতাবেক কাঠের ঘোড়া নির্মাণ করেছিল, অ্যাথিনার আজ্ঞাবলে, এপিয়াস নামের লোকটি। *অডিসি*তেও (অডিসি—৮:৪৯২-৪৯৪ এবং ১১:৫২৩-৫৩৫) বলা হয়েছে এপিয়াসই এই ঘোড়া বানিয়েছিল দেবী অ্যাথিনার সাহায্য নিয়ে, আর অডিসিয়ুস ঘোড়াটা ট্রয়ের নগর-দেওয়ালের মাঝে নিয়ে এসেছিল ট্রোজানদের প্রতারিত করতে। গ্রিক পুরাণের অন্যত্র আছে যে কাঠের ঘোড়া বানানোর এই বুদ্ধি ছিল অডিসিয়ুসেরই, আর এপিয়াস ছিল ঘোড়া বানানোর কারিগর মাত্র। যা হোক, *লিটল ইলিয়াড* এর পরে বলে:

তারপর তারা [গ্রিকরা] তাদের সেরা যোদ্ধাদের ভরল কাঠের ঘোড়ার পেটে; তারা আগুনে পুড়িয়ে দিল গ্রিকশিবিরের তাঁবু, কুটির ইত্যাদি এবং গ্রিক সেনাদলের মূল অংশ জাহাজে পাল তুলে সরে গেল পাশের টেনেডস্ দ্বীপে। ট্রোজানরা এ দৃশ্য দেখে ভাবল যে তাদের ভোগান্তির দিন বুঝি শেষ। তারা তাদের নগর-দেওয়ালের একটা অংশ ভেঙে কাঠের ঘোড়াটি টেনে শহরের মধ্যে নিয়ে এল এবং ভোজ উৎসবে মেতে উঠল এমনভাবে যেন বা তারা গ্রিকবাহিনীকে পরাস্ত করতে পেরেছে।

পরবর্তীকালের গ্রিক লেখক, কবিরা আমাদের জানান যে, এই ঘোড়ার পেটের মধ্যে লুকিয়ে ছিল ত্রিশজন (বা মতান্তরে চল্লিশ) গ্রিক যোদ্ধা, যাদের নেতৃত্বে ছিল অডিসিয়ুস। অডিসিয়ুসের সঙ্গে ছিল ছোট অ্যাজাক্স, ডায়োমিডিজ ও মেনেলাস নিজে। *লিটল ইলিয়াড*-এ অবশ্য ঘোড়ার পেটে লুকানো গ্রিক সৈন্যসংখ্যার এবং যোদ্ধাদের নামের উল্লেখ নেই। *লিটল*

ইলিয়াড শেষ হয়ে যায় হঠাৎ করেই। গল্পের বাকিটা নিয়ে এরপর শুরু হয় পরবর্তী মহাকাব্য।

ইলিয়ুপারসিস (The Iliupersis; ইলিয়ামের পতন বা ট্রয়ের পতন)

ইলিয়ুপারসিস বা 'ট্রয়ের পতন' নামের মহাকাব্যটিতে আছে মাত্র দুটো পর্ব, কিন্তু দুটোই অসংখ্য অ্যাকশনে ভর্তি এবং এ দুটো মিলে সমাপ্তি টেনে দেয় মহাকাব্য চক্রের ট্রোজান যুদ্ধসংক্রান্ত মূল বিষয়টির। *ইলিয়ুপারসিস*-এর রচয়িতা সেই একই মিলেটাসের আর্কটিনাস, যিনি এ-চক্রের আগের এক মহাকাব্য *ঈথিওপিস*-এর স্রষ্টা।

ইলিয়ুপারসিস-এ আমরা দেখি ট্রোজানরা কাঠের ঘোড়াটা ট্রয়ের নগর-দেওয়ালের ভেতরে নিয়ে এসেছে ঠিকই, কিন্তু তারা এ ঘোড়া নিয়ে সন্দিগ্ধ এবং তারা তর্ক-বিতর্ক করছে ঘোড়াটা নিয়ে কী করা যায় সে বিষয়ে। পরিশেষে তারা সিদ্ধান্ত নিল যে এই ঘোড়া তারা উৎসর্গ করবে দেবী অ্যাথিনার নামে; এরপর তারা মজে গেল আনন্দফূর্তি ও ভোজে, এই বিশ্বাস রেখে যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। তারপরও কেউ কেউ সন্দেহপরায়ণ থেকেই গেল। আমরা দেখি ভার্জিলের *ঈনিদ* মহাকাব্যের দ্বিতীয় পর্বে দেবতা পসাইডনের ট্রোজান যাজক লেইওকুন ট্রয়বাসীকে সতর্ক করে দিচ্ছে এই কথা বলে: 'ট্রোজানরা, তোমরা বিশ্বাস করো না এই ঘোড়াকে। এ ঘোড়া যা-ই হোক না কেন, আমি গ্রিকদেরকে ভয় পাই, এমনকি সেসব গ্রিককেও যারা উপহার নিয়ে আসে।' বলাবাহুল্য যে আমাদের সময়ের চালু উক্তি 'Beware of Greeks bearing gifts'-এর উৎপত্তি ভার্জিলের এই পঙ্‌ক্তি থেকেই। আর 'ট্রোজান হর্স' নামের কম্পিউটার ভাইরাস, যা হ্যাকারদের 'পেছন দরজা' দিয়ে কারো কম্পিউটারে ঢোকার পথ করে দেয়, তারও গোড়াতে আছে লেইওকুনের এই সতর্কবাণী।

লেইওকুনের সাবধানবাণীটি ছিল নিখুঁত, কারণ আমরা এর পরেই *ইলিয়ুপারসিস*-এ দেখি গ্রিক সৈন্যবাহিনী জাহাজের পাল তুলে রাতের অন্ধকারে পাশের টেনেডস দ্বীপে সরে যাচ্ছে আর অন্যদিকে ঘোড়ার পেটের ভেতরে থাকা গ্রিক যোদ্ধারা অতর্কিতে 'বের হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শত্রুসেনাদের ওপরে, হত্যা করছে অগণন শত্রু এবং দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ট্রয় জুড়ে।' রাজা প্রায়াম এসময় নিহত হয় জিউসের বেদির সামনে; আর অ্যাকিলিসের পুত্র নিওপ্‌টলেমাস হেক্টরের শিশুপুত্র অ্যাস্‌টায়ানাক্সকে নগর-দেওয়ালের উপর থেকে নিচে ছুড়ে ফেলে হত্যা করে।

ট্রোজানদের ওপরে গ্রিকদের এই নিরঙ্কুশ বিজয়ের পরে মেনেলাস ফিরে পায় তার স্ত্রী হেলেনকে, তাকে নিয়ে সে ফিরে যায় গ্রিক জাহাজবহরের কাছে, উদ্দেশ্য বাড়ির পথে যাত্রা করা। এর পরে আরও অগণন মৃত্যু, লুটতরাজ ইত্যাদি ঘটিয়ে বিজয়ী গ্রিকরা জাহাজের পাল খাটায় দেশে ফিরবে বলে, কিন্তু দেবী অ্যাথিনা এরই মধ্যে পরিকল্পনা নিয়ে রেখেছে যে সে গ্রিকদের হত্যা করবে তাদের দেশে ফেরত-যাত্রার এই পথে। আর এখানেই শেষ হয় *ইলিয়ুপারসিস*-এর।

নস্তোই (The Nostoi; ঘরে ফেরা)

প্রোক্লাস বলেন যে *নস্তোই* মহাকাব্যের লেখক ছিলেন ট্রয়েজেনের আজিয়াস, এবং এটা লেখা হয় সপ্তম বা ষষ্ঠ খ্রিস্টপূর্ব শতকে। ট্রয়েজেন ছিল গ্রিক মূল ভূখণ্ডের এক ছোট শহর। এই *নস্তোই* বা *ঘরে ফেরা* নামের মহাকাব্যে আমরা দেখি দশ বছর (মতান্তরে বিশ বছর) পরে গ্রিক বীরেরা যার যার ঘরে ফিরছে; একমাত্র অডিসিয়ুস ছাড়া তারা সবাই পাড়ি দিচ্ছে ঈজিয়ান সাগর। *নস্তোই* অনুসারে পাইলোসের রাজা নেস্টর ও আর্গজের রাজা ডায়োমিডিজ কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই ঘরে ফিরতে পারে, কিন্তু মেনেলাস তার ভাই আগামেমননের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসে ঘরের দিকে যাত্রার ক্ষণটি ধার্য করা নিয়ে। এরপর মেনেলাসের জাহাজ পড়ে এক বড় ঝড়ের মুখে, এবং সে শেষমেশ বহরের মাত্র পাঁচখানি জাহাজ নিয়ে মিশর পৌঁছায়। *নস্তোই*-তে মেনেলাসের স্পার্টায় ফেরার বিষয়ে আর কিছু বলা না থাকলেও আমরা *অডিসি*-তে দেখি, মেনেলাস অডিসিয়ুসের পুত্র টেলেমেকাসকে বলছে সে কীভাবে পরের আট বছর ঘুরে ফিরেছে পূর্ব ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী নানা অঞ্চলে, যেমন সাইপ্রাস, ফিনিশিয়া, ঈথিওপিয়া, সিডোন; আর মিশর তো আছেই (অডিসি—৩:২৯৯-৩০৪)। এত দীর্ঘকালের ঘোরাঘুরির পরে মেনেলাস হেলেনকে নিয়ে ফের পাড়ি জমায় স্পার্টার পথে।

অন্যদিকে রাজা আগামেমনন—যে ট্রয়ে আরও কিছুদিন থেকে গিয়েছিল দেবী অ্যাথিনাকে শান্ত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে—জাহাজে চড়ে বাড়ি ফিরতেই তার সঙ্গীসাথী সহ খুন হয় নিজের স্ত্রী ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রা ও স্ত্রীর বর্তমান প্রেমিক ইজিস্‌থাসের হাতে। কথিত আছে ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রা স্বামীকে খুন করে অতীতে আউলিস বন্দরে স্বামীর হাতে তার মেয়ে আইফিগেনিয়ার বলিদানের প্রতিশোধ নেয়। আবার অন্য সূত্র থেকে আমরা এমনও জানি যে, ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রা তার প্রেমিক ইজিস্‌থাসের সঙ্গে বাকি জীবন কাটানোর স্বপ্ন নিয়েই স্বামী আগামেমননকে হত্যা করেছিল। আগামেমননের এই হত্যা এবং তার দুই সন্তান অরেস্তেস ও ইলেকট্রাকে নিয়ে পরে তিন বিখ্যাত গ্রিক নাট্যকারের তিনজনই (অ্যাস্‌কাইলাস্, সফোক্লিস ও ইয়ুরিপিদিস) খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে তিনটি বিখ্যাত ট্র্যাজেডি লেখেন।

নস্তোই শেষ হয় আগামেমননের মৃত্যুর পরে মেনেলাসের ঘরে ফেরার কথা বর্ণনা করে। মেনেলাসের সঙ্গে তখন আছে হেলেন, যার কারণে এই মেনেলাস ঘর ছেড়েছিল আঠারো বছর আগে।

অডিসি (The Odyssey)

ট্রোজান মহাকাব্য চক্রের সপ্তম মহাকাব্য হোমারের *অডিসি*, যা *ইলিয়াড*-এর পাশাপাশি পুরো চক্রের মাত্র দ্বিতীয় সম্পূর্ণ টিকে যাওয়া মহাকাব্য। *নস্তোই* বা ঘরে ফেরার একই সুর এ মহাকাব্যেও বিদ্যমান। এর পর্বসংখ্যা, *ইলিয়াড*-এর মতোই, চব্বিশটি এবং পঙ্‌ক্তিসংখ্যা *ইলিয়াড* থেকে সামান্য কম (১২,১০৬)। এখানে আমরা শুধু গ্রিক বীর অডিসিয়ুসের (যার লাতিন নাম ইউলিসিস) ঘরে ফেরার গল্পটি পাই। ট্রোজান যুদ্ধের শেষে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অডিসিয়ুসের এই ঘর ইথাকায় ফিরতে লেগে যায় মোট দশ বছর। অডিসিয়ুসের এই দীর্ঘ ও

বিপদসংকুল সফরের সঙ্গে ট্রোজান যুদ্ধের মূল কাহিনীর প্রাসঙ্গিকতা নেই ঠিকই, কিন্তু *অডিসি*-তে অডিসিয়ুস নিজে কিংবা তার সহযোদ্ধাদের কেউ না কেউ প্রায়ই ট্রোজান যুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে এনে আমাদের শুনিয়ে দেয় যুদ্ধের বছরগুলোয় কী কী ঘটেছিল; আর চক্রের অন্য মহাকাব্যগুলো যেসব যুদ্ধ-পরবর্তী বিষয় ছুঁয়ে গেছে সেগুলোর ওপরেও আলোকপাত করে নানাভাবে, নানা দিক থেকে। *অডিসির* শেষে অডিসিয়ুস ইথাকা পৌঁছায় এবং তার পুত্র টেলেমেকাসকে সঙ্গে নিয়ে তার স্ত্রী পেনেলোপিকে এই বিশ বছর ধরে উত্যক্ত করতে থাকা প্রেমপ্রত্যাশী লোকদের প্রত্যেককে একে একে খুন করে। এরপর সে ইথাকায় রাজার পুরনো আসনে বসে কাটিয়ে দেয় তার বাকি জীবন।

টেলিগনি (The Telegony)

এটাই ট্রোজান মহাকাব্য চক্রের শেষ মহাকাব্য, যাতে আছে মাত্র দুটি পর্ব। প্রোক্লাসের মতে এটা রচনা করেন তখনকার গ্রিক উপনিবেশ আধুনিক লিবিয়ার সিরিনি শহরের ইয়ুগাম্মন নামের এক কবি। রচনাকাল *অডিসির* সামান্য কিছু পরে, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে; আর এটা লেখা হয় *অডিসিরই* উপসংহার লেখার মতো করে। এর শুরু হয় অডিসিয়ুসের হাতে খুন হওয়া লোকগুলোর দাফনের মধ্য দিয়ে আর শেষ হয় নিজেরই আরেক পুত্র টেলেগোনাসের হাতে পিতা অডিসিয়ুসের নিহত হওয়ায়। এই অডিসিয়ুস সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দেশে ফেরার সময়ে দেবী সার্সির (Circe) সঙ্গে যে একবছর ছিল, তখন অডিসিয়ুসের ঔরসে টেলেগোনাস গর্ভে এসেছিল দেবীর।

ইলিয়াড-এর ফোকাস

অ্যারিস্টোটলের কথাটিই ঠিক। হোমার সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন যে তিনি *ইলিয়াড*-এ ট্রোজান যুদ্ধের কোনো বছর বছর ব্যাপী ইতিহাসের বর্ণনা করবেন না, বরং পুরো মহাকাব্যের সব ঘটনাচক্র একটিমাত্র থিমের সুতোয় বেঁধে ঘোরাবেন—তাতে করে মাঝেমধ্যে ট্রোজান যুদ্ধের যেটুকু আমরা জানতে পারব সেটুকুই হবে 'ঐতিহাসিক', আর বাকিটা ট্রোজান যুদ্ধে অংশ নেওয়া মানুষদের যার যার ব্যক্তিগত রাগ-বিরাগ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির গল্প। হোমারের এই থিমটি হচ্ছে অ্যাকিলিসের ক্রোধ, যার উল্লেখ কবি রেখেছেন মহাকাব্যের একেবারে প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই, আর সে ক্রোধ থেকে গ্রিকদের উপর নেমে আসবে অসংখ্য মৃত্যু ও অগণন দুঃখপীড়া নিয়ে, এমনকি অ্যাকিলিসের নিজের উপরেও। লক্ষণীয় যে মহাকাব্যটির প্রথম সাত লাইনের প্রস্তাবনা অংশে কবি স্মৃতি ও সংগীতের দেবী মিউজকে 'ট্রোজান যুদ্ধের কাহিনী' গেয়ে শোনাতে বলেননি, বরং তিনি স্পষ্টই দেবীকে বলেছেন যে, দেবী তুমি আমাদের 'অ্যাকিলিসের ক্রোধের কাহিনী' গেয়ে শোনাও। আরও লক্ষণীয় যে এই 'প্রস্তাবনা'র কোথাও ট্রয় নগরের নাম পর্যন্ত নেই, যদিও *ইলিয়াড* শব্দের অর্থ 'ইলিয়ামকে নিয়ে একটি গান' (ইলিয়াম ট্রয় নগরীরই প্রাচীন নাম, যেমন আরেক নাম ইলিয়ন)।

তো, মহাকাব্যের নাম ট্রয়ের গান আর মহাকাব্যের থিম বা বিষয়বস্তু অ্যাকিলিসের ক্রোধ, এর ফলে আমরা একটি জাতির সর্বনাশা এক যুদ্ধে লিপ্ত থেকে অনিবার্য পতনের কাহিনীটা জানছি সেই জাতির শত্রুপক্ষের এক বীরের ব্যক্তিগত ক্রোধের বহিঃপ্রকাশের

প্রেক্ষাপটে। জাতির রাজনৈতিক কাহিনী, অতএব, এখানে বলা হচ্ছে ব্যক্তির ব্যক্তিগত আবেগের জায়গা থেকে। সুতরাং *ইলিয়াড*-এর ঘটনা-পরম্পরাকে অবধারিতভাবে যেতে হয়েছে কৃচ্ছ্রতা ও স্বল্পবয়ানের রাস্তায়। কবিকে অনেক আঁটোসাঁটো করে আনতে হয়েছে এর ফোকাস, যা কিনা আকারে নিঃসন্দেহে অনেক বড় হত যদি কবি কোনো ব্যক্তিকে *ইলিয়াড*-এর কেন্দ্র না বানিয়ে কোনো জাতিকে এর কেন্দ্র বানাতেন। ফোকাসের এই আঁটোসাঁটো ব্যাপারটির সোজাসাপটা প্রমাণ পাওয়া যাবে কয়েকটা উদাহরণ দিলেই; যেমনঃ এক. *ইলিয়াড*-এর সমস্ত অ্যাকশনের চার-পঞ্চমাংশই ঘটে স্রেফ চার দিনের মধ্যে ও সেই দিনগুলো শেষের রাতের ভেতরে (১১তম থেকে ১৮তম পর্বের পুরোটাই তো মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনা); দুই. এর গল্প আবর্তিত হয় শুধু বড়মাপের বা অভিজাত যোদ্ধাদের নিয়ে, সাধারণ সৈন্যদের দৈনন্দিনের জীবনগাথার মধ্যে নয়; তিন. এখানে অনেকানেক বীরের নাম নেন হোমার, কিন্তু দু পক্ষের (নারীসহ) মাত্র জনাবিশেক মানুষকে কেন্দ্র করেই তিনি গড়ে তোলেন এর আখ্যান; চার. *ইলিয়াড*-এর মানুষদের অ্যাকশনগুলো ঘটে ধরাবাঁধা মাত্র কয়েকটি জায়গায়ঃ যেমন সমুদ্রপারের গ্রিক শিবিরে, এবং সামনের ট্রোজান সমতল বা ট্রয় নগরে; আর দেবতাদের সবকিছু ঘটে শুধু দু স্থানে—হয় মাউন্ট অলিম্পাসে, না হয় ট্রয়ের পাশের আইডা পর্বতের চূড়ায়; পাঁচ. হোমার এখানে গ্রিক ও ট্রোজানদের মধ্যে বড় কোনো সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় পার্থক্যের ইঙ্গিত দেন না। এরা দু পক্ষই পুজো করে একই দেবদেবীর, কথা বলে একই ভাষায়, এবং তাদের মূল্যবোধও এক। দুই বাহিনীই চায় যে যুদ্ধ শেষ হোক, যাতে করে তারা পরিবারের সঙ্গে শান্তিতে জীবন কাটাতে পারে; যদিও গ্রিকরা, আমরা দেখি, আক্রমণকারী হিসেবে যথেষ্ট মরিয়া ও একাট্টা ট্রয় নগর দখলের ব্যাপারে, আর ট্রোজানরা, আত্মরক্ষাকারী হিসেবে, স্রেফ রক্ষা করে যাচ্ছে তাদের ঘর-পরিবার। ট্রোজানদের কাছে, দেখা যায়, যুদ্ধই শেষ কথা নয়, কারণ যুদ্ধের বাইরেও তাদের জীবন আছে, এ দেশ তাদেরই। আর বহিরাগত গ্রিকরা যেহেতু যুদ্ধের জন্য ঘর ছেড়েই এসেছে, তাই যুদ্ধে জেতা ছাড়া তারা আর অন্য কোনো বিষয়েই আগ্রহী নয়।

হোমার এই আঁটোসাঁটো স্বল্প-বয়ানের পাশাপাশি পাঠকের মনে অবশ্য আরেক ধরনের অনুভূতিও তৈরি করেন। তিনি আমাদের এমন এক ধারণা দেন যে তিনি বুঝি পুরো ট্রোজান যুদ্ধের গল্পটাই শোনাবেন আমাদের— এমনকি এই যুদ্ধের আগের ও পরের কাহিনীও। বহুবার তিনি নানা প্রসঙ্গে টেনে আনেন *ইলিয়াড*-এর আগের কথা, আর বহুবার বলেন যে *ইলিয়াড*-এর শেষে অ্যাকিলিসের মৃত্যু হবে, ট্রয় নগরী ধ্বংস হবে, হেক্টরের শিশুসন্তানটির নির্মম হত্যা হবে, ইত্যাদি। তাছাড়া, *ইলিয়াড* চলাকালীনই আমরা যেভাবে জানতে পারি *ইলিয়াড*-এর বহু আগে নশ্বর পেলিউসের সঙ্গে ঘটে যাওয়া দেবী থেটিসের বিয়ের কথা (যা থেকে জন্ম নেয় অ্যাকিলিস), বা প্যাট্রোক্লাসের কীভাবে অ্যাকিলিসের সঙ্গে শৈশব থেকে বন্ধুত্ব হয়েছিল সেই গল্প, কিংবা বিখ্যাত 'প্যারিসের রায়'-এর কথা, যে রায়ের পরিণতিতেই ট্রোজান যুবরাজ প্যারিস স্পার্টার রানি হেলেনকে স্ত্রী হিসেবে পায় এবং সূচনা ঘটায় এই যুদ্ধের, তাতে করে হোমার সুকৌশলে *ইলিয়াড*-এর পঞ্চাশ দিনের ক্যানভাসটিকে কয়েক বছরের বানিয়ে ফেলেন। দেখা যায়, আমরা ট্রোজান যুদ্ধের পূর্বাপর এখানে জানতে

পারব না জেনেই *ইলিয়াড* পাঠ করতে বসেছি ঠিকই, কিন্তু একসময় আমাদের মনে হবে যে পুরো কাহিনীটিই বুঝি শুনছি আমরা।

আমাদের বলা হয় গ্রিকরা একদিন গ্রিসের বিয়োশার আউলিস বন্দর থেকে এই অভিযানের শুরু করেছিল, গ্রিক প্রোটেসিলেয়াস ছিল ট্রয়ের উপকূলে গ্রিকরা নামবার পরে নিহত প্রথম গ্রিক যোদ্ধা; তারপর মেনেলাস ও অডিসিয়ুস দূত হিসেবে ট্রোজানদের কাছে গিয়েছিল যুদ্ধ না করেই হেলেনকে নিয়ে ফেরত যাবার বাণী বহন করে, কিন্তু ট্রোজানরা তাদের সে দাবি প্রত্যাখ্যান করে দীর্ঘ নয় বছর ধরে গ্রিকদের ইলিয়াম অবরোধ করে রাখার কারণ ঘটায়। হোমার এই নয় বছরের ঘটনাপ্রবাহের দিকে মাঝেমধ্যে তাঁর ফোকাস নিয়ে যান, কিন্তু খুব বেশি কিছু জানা যায় না নয় বছরের দীর্ঘ সময়কালের সাপেক্ষে। হোমার তাঁর স্বদেশি গ্রিক শ্রোতাদের জন্য গ্রিকদের নয় বছরেও ট্রয় দখল করতে না পারার ব্যর্থতাটুকুর পেছনে কোনো জোরালো যুক্তি খাড়া করতে পারেননি; সেটা শুধু হোমার নয়, অন্য কোনো গ্রিক লেখক-কবিই পারেননি পরবর্তীকালেও। গ্রিকদের ট্রয় অবরোধের এই নয়টি বছর আমাদের একরকম চোখের আড়ালেই থেকে গেছে চিরকাল।

এর শুধু একটিই ব্যতিক্রম আছে *ইলিয়াড*-এ। *ইলিয়াড*-এর বীজ লুকানো রয়েছে এই নয় বছরের মধ্যেই ঘটা দুটি ঘটনার ভেতরে। এ-সময়েই অ্যাকিলিস চুপচাপ ট্রয়ের উপকূলে বসে থেকে সময় না কাটিয়ে ট্রয়ের পার্শ্ববর্তী দুটো শহর দখল করেঃ একটি থিবি, যেখান থেকে সে ধরে আনে ক্রাইসিয়িস নামের এক মেয়েকে, যার মালিকানাকে কেন্দ্র করেই *ইলিয়াড*-এর শুরু; আরেকটি লারনেসাস, যেখান থেকে সে পায় তার প্রেয়সী/ক্রীতদাসী ব্রাইসিয়িসকে, যাকে অ্যাকিলিসের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে রাজা আগামেমনন সূচনা ঘটায় অ্যাকিলিসের সঙ্গে তার ভয়ংকর কলহের। তা ছাড়া হোমার এখানে আরও জোর দেন এসব ছোটখাট যুদ্ধজয়ের পরে লুটের মাল ভাগাভাগির বৈষম্যের ওপরেও, যাতে করে আমরা দেখি ব্রাইসিয়িসকে হারানো থেকে জন্ম নেওয়া অ্যাকিলিসের ক্রোধে যোগ হয় আরও বেশি ক্ষোভ ও বঞ্চনার আগুন।

অন্য কথায়, *ইলিয়াড* ট্রোজান যুদ্ধের শেষ বছরের শেষ কয়টি দিনের কাহিনী ছাপিয়ে হয়ে উঠেছে আরও বড় এক কালিক ও স্থানিক আখ্যান; 'ট্রোজান মহাকাব্য চক্রে'র প্রায় সবকটি মহাকাব্যই এখানে নানাভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে হোমারের এক বিশেষ ধরন ও প্রকরণের ফোকাসের হেতু। পশ্চিমা সাহিত্যের সূচনা ঘটানো এই সৃষ্টিকর্মে এভাবেই স্বল্পায়তনের এক কাহিনী ব্যাপ্তিতে হয়ে উঠেছে বিশাল; আঁটোসাঁটো করে ধরা এক ফোকাস আঁটোসাঁটো থেকে গেছে ঠিকই, কিন্তু একইসাথে তা আলো ফেলেছে দুই জাতির অগণন মানুষের জয় ও পরাজয়ের ব্রহ্মা-সমান এক ক্যানভাসের ওপরে। এতে করে পরবর্তীকালের কবি, সাহিত্যিকেরা সুন্দরভাবে শিখেছেন যে সাহিত্যে কাহিনী বর্ণনায় কীভাবে আপাত ক্ষুদ্রতার ভেতরেও বিশালত্বকে ধরা যায়।

হোমারের জীবন (?)

হোমার (সেই বিশাল এক ছায়া যাকে আমরা 'হোমার' নামে ডাকি) রীতিমতো এক ভুতুড়ে চরিত্র, যাঁর জীবনীকারেরা (বা যাঁর আবিষ্কারকেরা) বিশ্বাস করতেন যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ট্রয়ের পতনের—অর্থাৎ আনুমানিক ১১৮৪ খ্রিস্টপূর্ব সালের—বেশি কাল পরে নয়।[২৬]

আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান এরাটোসথেনিস্—যিনি মোটামুটি নিখুঁতভাবেই পৃথিবীর বেড়ের দৈর্ঘ্য হিসাব করে বের করার কারণে বিখ্যাত—তাঁর কালপঞ্জিতে লিখেছিলেন যে হোমার হেক্টর ও অ্যাকিলিসের সমকালীন একজন মানুষ। প্রাচীন গ্রিক মানুষদের মধ্যে হোমার নিয়ে কখনোই কোনো বিতর্ক ছিল না। তারা বিশ্বাস করত, হোমার অতি অবশ্যই রক্ত-মাংসের একজন মানুষ যিনি কোনো দূর অতীতকালে এমন কিছু সাহিত্যকর্ম তৈরি করে গেছেন যার উপরে দাঁড়িয়ে আছে পুরো গ্রিক সংস্কৃতি। তারা *ইলিয়াড* ও *অডিসি* ছাড়াও হোমারের কাজ বলে দাবি করতেন আরও বেশ কিছু কাব্য ও কবিতাকে, যেগুলোর অধিকাংশই হয় হারিয়ে গেছে, না হয় আধুনিক গবেষকরা সেসব আর হোমারের সৃষ্টি বলে মনে করেন না। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটাস সন্দেহ তুললেন *ইলিয়াড* ও *অডিসি*-র বাইরে এসব কবিতা হোমারের কিনা তা নিয়ে, কিন্তু হোমার নামে কেউ ছিল কি না এমন সন্দেহ তাঁর মাথায় একবারের জন্যও আসেনি।[২৭] এরই কয়েক দশক আগে বিখ্যাত গ্রিক নাট্যকার অ্যাস্কাইলাস, যাঁর কোনো নাটকই হোমারের *ইলিয়াড* বা *অডিসির* ওপরে ভিত্তি করে লেখা নয়, আমাদের বললেন যে তাঁর সব সৃষ্টিই 'হোমারের মহা ভোজ থেকে নেওয়া টুকরোমাত্র'। অ্যাস্কাইলাস এ-কথার মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত রাখলেন যে, *ইলিয়াড* ও *অডিসির* বাইরে অন্য হোমেরিক কবিতা দিয়ে তিনি অনুপ্রাণিত। যদি তা হয়েও থাকে, অন্তত আমরা সেসবের কোনো খোঁজ আজও পাইনি। তবে হোমারের খ্যাতির খোঁজ আমরা ঠিকই পেয়েছি, বহুকাল আগে থেকেই। সেই কবেকার দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের এক মারবেল রিলিফে (যা ইন্টারনেটে একটু খোঁজ করলেই পাঠক পেয়ে যাবেন) প্রিনির আরকেলাওস (Archelaos of Priene) এক চমৎকার রূপকে-ভরা ছবি ফুটিয়ে তুললেন: হোমারের মাথায় দুটি তাজ, একটি সময়ের ও অন্যটি স্থানের; তাঁকে ঘিরে আছে মিউজ দেবীরা (ইতিহাস, ট্র্যাজেডি, কমেডি ও কাব্যের চার দেবী) এবং তাঁর দুই সন্তান— *ইলিয়াড* ও *অডিসি*— হাঁটু গেড়ে বসে আছে তাঁর এক পাশে। আর কবির মাথার ওপরে আছে দেবরাজ জিউস, প্রধান দেবদেবীদের সঙ্গে নিয়ে। জিউস, দেবদেবীদের পিতা, প্রতিফলিত হয়ে আছে হোমারে, যিনি কিনা বিশ্বমানবের পিতা।[২৮]

'বিশ্বমানবের পিতা' তো অন্য অর্থে মানব ইতিহাসেরও পিতা। হোমারের দুই মহাকাব্যই শেষ হয় দশ বছরের এক কালপর্বের পরে: *ইলিয়াড*, গ্রিকরা ট্রয়ের উপকূলে পা রাখার দশ বছর বাদে; আর *অডিসি*, ট্রয় নগরের পতনের দশ বছর পরে। গ্রিকদের কাছে দশ বছর সময়টার মধ্যে সম্ভবত কোনো জাদু বা কিংবদন্তির ব্যাপার ছিল, সম্ভবত এটা ছিল দেবতাদের সময় ও মানুষের সময়ের মধ্যেকার বিভাজনরেখা। তাদের মতে, গ্রিক ইতিহাসের শুরুই হয়েছিল ট্রয়ের ধ্বংসের বছরটি থেকে। গ্রিক ইতিহাসের এর আগের

সময়কালের টুকটাক সাক্ষ্য আমরা পাই বটে, কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ১১৮৪ সালের দিকে এই আনাতোলিয়ান শহরটির ধ্বংস হওয়ার মধ্য দিয়েই সূচনা ঘটে গ্রিক সভ্যতার নানা ঘটনার সাক্ষ্যপ্রমাণসহ ঐতিহাসিক বিবরণের। গিলগামেশের এপিক বা প্রাচীন মিশরীয়দের নানা কাহিনী সব প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা, কিন্তু হোমার ও তার কাব্যগুলোর মাধ্যমেই শুরু আমাদের প্রথমবারের মতো ভালোভাবে জানা মানব ইতিহাসের, আমাদের জানা-পড়া-মুখস্থ সব গল্পকাহিনীর।

প্রাচীন গ্রিসের সাহিত্যকর্মগুলোর মধ্যে হোমারের কাব্যই ছিল প্রথম কোনো সৃজনশীল সৃষ্টি যা লিখিত ভাষার সুবিধাগুলো ভোগ করতে পেরেছিল: এক. এর পক্ষে আয়তনে বড় হওয়া সম্ভব, কারণ কবিকে আর তার কাব্য ছোট করতে হচ্ছে না মুখস্থ রাখার স্বার্থে; দুই. লিখিত জিনিস আয়োজনে পুরোটাই সমমানের হওয়া সম্ভব— প্লট, চরিত্রচিত্রণ ইত্যাদি বাচনিক কবিতার (oral poetry) মতো সেখানে একেক সময়ে একেক মানের হয়ে দাঁড়ায় না; তিন. এটা ধারাবাহিকতা রক্ষায় বেশি সক্ষম, কারণ লিখিত টেক্সটে আপনি আগের বা পরের টেক্সটের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন যে কোনো তথ্য, যে কোনো ঘটনা, নাম, তারিখ ইত্যাদি; চার. ঐক্যতানের দিক থেকেও এটা বড় হয়, কারণ কবির চোখ এখানে কবিকে সাহায্য করে বাচনিক কবিতায় কবির একমাত্র বন্ধু কানকে, কবি এখন চোখ দিয়ে দেখে নিতে পারেন যে লিখিত পৃষ্ঠায় তার শব্দগুলোর মধ্যেকার পারস্পরিক চেহারাটা কেমন দেখাচ্ছে। সর্বোপরি লিখিত কবিতা কবির সৃষ্টিকে দেয় আরও বৃহৎ, আরও উদার এক বিচরণক্ষেত্র, এ-অর্থে যে এর যিনি প্রাপক তাকে আর কবির স্থান ও কালে বাস না করলেও চলে।

গ্রিসে বর্ণমালাভিত্তিক লিখনপ্রথার শুরু খ্রিস্টপূর্ব নবম বা অষ্টম শতকের আগে নয়। এর আগে মাইসিনিয়ান সভ্যতার পতন এবং 'Linear B' নামের লিখনপদ্ধতি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরে আমরা দেখি দুই থেকে তিনশ বছরের এক শূন্যগর্ভ সময়। পরে বর্ণমালাভিত্তিক প্রথম লিখনের আমরা খোঁজ পাই খ্রিস্টপূর্ব মধ্য-অষ্টম শতকে গিয়ে, যাকে হেরোডোটাস বলেছিলেন 'ফিনিশিয়ান বর্ণমালা'। *ইলিয়াড*-এর ষষ্ঠ পর্বে গ্লকাস ডায়োমিডিজকে তার বংশপরিচয় দেওয়ার সময়ে বলে, 'ভাঁজ করা কাঠের ফলকে খোদাই করা নানা সাংকেতিক এক বার্তা'র কথা (*ইলিয়াড*—৬:১৬৯)। হোমারের সৃষ্টিকর্মের মধ্যে লিখনের (writing) এটাই একমাত্র উল্লেখ। হতে পারে কবির নিজেরও এসব কাঠের ফলকে সংকেত দিয়ে লেখার অভিজ্ঞতা ছিল। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে অবশ্য *ইলিয়াড*-এর প্রথম ও আদি আয়োনিয়ান পদকাররা *ইলিয়াড*কে কাঠের ফলকে লেখেননি, লিখেছিলেন মিশর থেকে আনা প্যাপিরাসের মোড়ানো ফালিতে (scroll)।[২৯] খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের আয়োনিয়ান গ্রিকরা ছিল খুব উদ্যমী চরিত্রের ব্যবসায়ী যারা এমনকি নীল নদের পশ্চিম অববাহিকা পর্যন্ত তাদের দোকান খুলে বসেছিল। এরাই মিশর থেকে ঘরে নিয়ে আসে প্যাপিরাস কাগজের মোড়ানো ফালি— সে যুগের নতুনতম আবিষ্কার। হোমার যদি সত্যি ওরাল পোয়েট্রির বাইরে গিয়ে তাঁর কাব্যগুলো লিখে থাকেন, তাহলে মানতে হবে যে সেই কাব্যের দৈর্ঘ্য নির্ভরশীল ছিল এরকম এক একটা ফালিতে কতগুলো শব্দ আঁটানো যায় তার

ওপরে। *ইলিয়াড* ও *অডিসি*, দুটোরই চব্বিশটা করে পর্বে ভাগ হওয়ার ব্যাপারটা সম্ভবত প্যাপিরাসের মোড়ানো ফালির ঐ দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা থেকেই ঘটেছিল।[৩০]

হোমার তাঁর কাব্য মুখে মুখে না লিখে সৃষ্টি করেছেন সে সিদ্ধান্তে যাওয়ার আগে আমাদের বুঝে নেওয়া উচিত আদতে হোমার নামে কেউ আসলেই ছিলেন কি-না, আর যদি থাকেনও তবে কোথায় তাঁর জন্ম হয়েছিল, কীভাবে তাঁর জীবন কেটেছিল। মোট সাতটি শহর নিজেদের হোমারের জন্মস্থান হিসেবে দাবি করে থাকে: কিওস (Chios), স্মিরনা (Smyrna), কোলোফন (Colophon), সালামিস (Salamis), রোডজ্ (Rhodes), আর্গজ (Argos) এবং আথেন্স (Athens)। সপ্তদশ খ্রিস্টাব্দের ইংরেজ কবি টমাস হেয়উড এই মাথার ওপরে ছাদহীন কবির জন্মস্থান নিয়ে তাঁর মৃত্যু-উত্তরকালে সাতটি শহরের কাড়াকাড়ি করা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন:

Seven cities warr'd for Homer, being dead,
Who, living, had no roof to shroud his head.

একইরকম কথা আছে মিগেল দি সার্বেন্তেসের বিখ্যাত উপন্যাস *দোন কিহোতে*-তে (Don Quixote), যেখানে 'সিদে হেমেতে দোন কিহোতের জন্মস্থান ঠিক কোথায় তা বলতে চাইছিল না, কারণ সে মনে মনে চাইছিল যে লা মাঞ্চার সব গ্রাম, সব শহর নিজেদের মধ্যে মারামারি করুক তার জন্মস্থান যে সেখানেই সেই দাবিটা তুলে—তারা বলুক যে দোন কিহোতে তাদের, ঠিক যেভাবে সাত গ্রিক শহর মারামারি করছে হোমার কার তা নিয়ে।

প্রাচীনকাল থেকেই গ্রিকরা বিশ্বাস করত, হোমার জন্মেছিলেন কিওস দ্বীপে। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের শেষভাগে রচিত 'ডেলিয়ান অ্যাপোলোর প্রতি স্তোত্রগীত'-এ (যে কবিতা হোমারের রচনা বলে অনুমান) বলা হল যে এটার কাব্যকার একজন 'অন্ধ লোক যার বাস উঁচুনিচু কিওসে।' কিওসই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠল হোমারের জন্মস্থানের মূল দাবিদার। এখনও ট্যুরিস্টদের সেখানে দ্বীপের প্রধান শহর থেকে চার মাইল দূরে এক পাথরের খাঁজ দেখিয়ে বলা হয় যে হোমার ও হোমেরিদেরা (হোমার সম্প্রদায়) এই পাথরের ওপরে বসে একে অন্যকে কবিতা গেয়ে শোনাতেন। আরও দুটো যুক্তি বলে যে হোমার কিওসেরই মানুষ ছিলেন: এক. হোমারের কাব্যের ভাষা মূলত আয়োনিক গ্রিক, কিওস ছিল সেই আয়োনিয়ারই অংশ; দুই. *ইলিয়াড*-এ এমন কিছু ভূ-দৃশ্যের বর্ণনা আছে (যেমন ট্রয়ের সমতল থেকে দেখা সামোথ্রেইসের পর্বতশিখর) যা সাক্ষ্য দেয় এর স্রষ্টা এই কিওস অঞ্চলেরই কেউ।

কিওসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কোস দ্বীপ দাবি রাখল— হোমার মারা গেছেন কোসে, এবং তাঁর সমাধিও আছে সেখানে। কোসের এই দাবির উল্টো সাইপ্রাসও জানাল একই দাবি। সাইপ্রাসের লোকেরা বিশ্বাস করত, তাদের দেশের এক মহিলা, নাম থেমিস্টো, ছিলেন হোমারের মা; হোমার নাকি চেয়েছিলেন যে তাঁর কবর হোক তাঁর মা যে মাটিতে শুয়ে আছেন, সেখানেই।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতকে হোমারের এই ছায়া-শরীরে কাঠামো দান করার

জন্যই লেখা হল তাঁর বেশকিছু আত্মজীবনী, আর সেগুলোকে বিশেষ বিশ্বাসযোগ্যতা দেবার স্বার্থে খ্যাতিমান সব লোকের নাম জুড়ে দেওয়া হল তাদের লেখক হিসেবে। এদের মধ্যে যেটা দৈর্ঘ্যে সবচেয়ে বড়, সেটাকে বলা হল ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটাসের লেখা (যে দাবি এরই মধ্যে পুরো মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে), যেখানে হেরোডোটাস হোমারের দীর্ঘ সব ভ্রমণেরও বিবরণ দিয়েছেন এবং দাবি করেছেন যে হোমারের মায়ের নাম ছিল ক্রেথেইস, থেমিস্টো নয়।

হেরোডোটাসের লেখা হিসেবে দাবি তোলা এই *খরভব ড়ভ ঐড়সবৎ* গ্রন্থটির রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতাব্দী। এর সত্যিকারের লেখক ছিলেন স্মিরনার এক লোক, আর তাই স্মিরনাকে মহত্ত্ব দান করার স্বার্থে তিনি লিখলেন যে, স্মিরনাই হোমারের জন্মস্থান। 'হোমার ছিলেন ঈওলিয়ান। তিনি যে আয়োনিয়ান বা ডোরিয়ান কেউ ছিলেন না, তা আমি প্রমাণ করেছি আমার এই লেখায়', রীতিমতো আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বললেন হোমারের এই জীবনীপ্রণেতা। এর লেখক যে অঞ্চলের অধিবাসীই হোন না কেন, এটা সত্য যে *খরভব ড়ভ ঐড়সবৎ* গ্রন্থের এবং হোমারের মহাকাব্য দুটির ভাষা একই— আয়োনিয়ান গ্রিক।

এ বই অনুযায়ী, হোমারের নানা-নানী মারা যান বেশ অল্প বয়সে। মৃত্যুর সময় তারা তাদের মেয়ে ক্রেথেইসকে রেখে যান ক্লিনাক্স নামের তাদের এক বন্ধুর কাছে। কয়েক বছর পরে ক্রেথেইস প্রেমে পড়ে গর্ভবতী হয় এবং লোকলজ্জার ভয়ে তখন ক্লিনাক্স তাকে নতুন নির্মিত শহর স্মিরনায় পাঠিয়ে দেয়। সেখানেই, লেখকের দাবি, হোমার জন্মগ্রহণ করেন ট্রোজান যুদ্ধের ঠিক ১৬৮ বছর পরে, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ১,০১৬ সালে। তাঁর জন্ম হয় স্মিরনার মেলেস নদীর পাড়ে, তাই মা ক্রেথেইস পুত্রের নাম রাখেন মেলেসিজেনেস (Melesigenes)। কবি জন মিলটন লিখেছেন: 'Blind Melesigenes thence Homer call'd'। পরে এই পুত্র বড় হলে, স্মিরনায় বেড়াতে যাওয়া এক লোক তাকে রাজি করায় এ শহর ছেড়ে সমুদ্রে পাড়ি জমাতে। তা-ই করে ছেলেটি— সে জাহাজ থেকে জাহাজে করে ঘুরে বেড়ায় *অডিসি*-তে অডিসিয়ুসের দেখা অধিকাংশ জায়গায়, যার মধ্যে ইথাকাও রয়েছে। এই জাহাজেই সে, প্রথমবারের মতো, শুরু করে কবিতা গাঁথা, এবং এসব জাহাজভ্রমণে তার সঙ্গে পরিচয় হওয়া লোকদেরই সে পরে তার মহাকাব্যের বিভিন্ন চরিত্র হিসেবে রূপ দেয়। এরই সঙ্গে এ বইয়ের লেখক আরও জানান ইথাকার মানুষদের দাবি যে, হোমার ইথাকাতেই অন্ধ হয়েছিলেন, সেটা ভুল। তাঁর ভাষ্যমতে, হোমার অন্ধ হন কোলোফোনে গিয়ে (এ কথায়, স্বাভাবিকভাবেই, সব কোলোফোনিয়ানরা আনন্দের সঙ্গে সায় দেয়)। লেখকের আরও দাবি, আমাদের এই কবি তাঁর নাম মেলেসিজেনেস থেকে বদলে হোমার রাখেন সিম্মেরিস শহরে গিয়ে। সেখানে এই অন্ধ কবি স্থানীয় শাসনকর্তাদের প্রস্তাব দেন, তারা যদি তাঁর থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেয়, তাহলে তিনি তাদের শহরটাকে তাঁর গানের মধ্য দিয়ে বিখ্যাত বানিয়ে দেবেন। শাসকর্তারা রাজি হন না তাঁর এই প্রস্তাবে; তারা যুক্তি তোলেন, একবার যদি এই ধারার চল হয়ে যায় তো শীঘ্রই সিম্মেরিস অন্ধ ফকিরে (সিম্মেরিয়ান ভাষায় অন্ধ ফকিরকে বলে 'homers') ভরে যাবে।

তাদের লজ্জা দেবার জন্যই সিম্মেরিস ছাড়ার সময়ে মেলেসিজেনেস তাঁর নিজের নতুন নাম রাখেন 'Homer'।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে দার্শনিক হেরাক্লিটাস তখনকার দিনের প্রবল জনপ্রিয় এই অনুমান মেনে নিয়েছিলেন যে, হোমার এক বাচ্চার জিজ্ঞাসা করা উকুন ধরা বিষয়ক এক ধাঁধার সমাধান দিতে না পারার হতাশা থেকেই মারা যান। আর *Life of Homer*-এর লেখক বললেন, হোমার মারা গিয়েছিলেন আইওস (Ios) দ্বীপে এবং তা কোনো শিশুর জিজ্ঞাসা করা উকুন বিষয়ক ধাঁধার উত্তর দিতে না পারার জন্য নয়, বরং 'তাঁর শরীর ও মনের সার্বিক দুর্বলতা' থেকে।

খুব প্রাচীনকাল থেকেই হোমারকে তাঁরই সৃষ্ট কোনো চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার একটা রেওয়াজ ছিল। তাঁর শ্রোতা ও পাঠকদের কাছে তিনি ছিলেন পদ্যকার, সুরকার এবং মহাকাব্যিক গানের গায়ক—'কবিদের এক রাজা' যাঁকে মাঝেমধ্যে অন্য কবিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ারও আমন্ত্রণ জানানো হত। হেরাক্লিটাসের মতে, ওরকম এক প্রতিযোগিতায় একবার হোমার ও হেসিয়ড মুখোমুখি হয়েছিলেন। চারণকবিদের জনসমক্ষে কবিতা আবৃত্তির কথা হোমারের *অডিসি*-তেই আছে, যেখানে রাজা আলসিনুসের দরবারে অন্ধ চারণকবি ডেমোডোকাস বীণা বাজিয়ে তিনটা কাহিনী গেয়ে শোনায়: প্রথম, এমন এক গান 'যার খ্যাতি ওই সময়ে আকাশ ছুঁয়েছিল' এবং যার বিষয়বস্তু 'অ্যাকিলিস ও অডিসিয়ুসের মধ্যে কলহ'; দ্বিতীয়, শ্রোতাদের মন খুশি করতে 'দেবতা আইরিজ ও দেবী আফ্রোদিতির প্রেমকাহিনী'; আর তৃতীয়, 'ইউলিসিসের ট্রয় থেকে ঘরের পথে যাত্রাশুরুর কাহিনী, সেইসঙ্গে কাঠের ঘোড়া ও ট্রয়ের বিলুপ্তির গাথা' (অডিসি— ৮: ৫৫২-৫৮৪)। এই তিনের প্রথম ও শেষেরটি কোনো গল্পের ভেতরে গল্প বলার চমৎকার দুই উদাহরণ, কারণ ডেমোডোকাস যখন ওই গান (বা কবিতা) গাইছে তখন দর্শক-শ্রোতার সারিতে অডিসিয়ুস নিজে বসা। অডিসিয়ুস তার নিজের অতীতের কথা এক চারণকবির মুখে এইভাবে শুনে, অতীতকে মনে করে, কেঁদেও ফেলে সে সময়। পৃথিবীর ইতিহাসের এই প্রথমদিককার চারণকবি ও সুরস্রষ্টাদের বিষয়ে আমরা বলতে গেলে কিছুই জানি না, শুধু এটুকু ছাড়া যে তারা শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াতেন, কবিতা বা গান গেয়ে শোনাতেন জনগণের মজলিসে কিংবা রাজাদের দরবারে এবং তারা— বেশিরভাগই— অন্ধ ছিলেন। হোমার নিজে আমাদের বলছেন: 'তাদের কাজ ছিল লড়াকু বীরদের বিখ্যাত সব গাথা গেয়ে শোনানো' (অডিসি— ৮:৮৭)। এখানে হোমার 'কবি' বলতে গ্রিক শব্দ 'aoidis' ব্যবহার করেছেন, যার আক্ষরিক অর্থ 'গায়ক'। এরা, সন্দেহ নেই, বেঁচে থাকতেন তাদের শ্রোতাদের দয়ার ওপরে, অন্তত শোওয়ার জায়গা ও খাওয়ার ব্যাপারে। *অডিসি*-র শেষ ঘটনাগুলো ঘটতে অনেকগুলো পর্ব লেগে যাচ্ছে, ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছাতে অনেক বিলম্ব করা হচ্ছে দেখে টি. ই. লরেন্স বা 'লরেন্স অব অ্যারাবিয়া' মন্তব্য করেন: 'চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌঁছাতে দশ পর্ব ধরে এই ক্লান্তিকর দেরির পেছনে সম্ভবত কারণ ছিল একটাই: হতদরিদ্র চারণকবি তার আতিথ্যকর্তা থেকে থাকা-খাওয়ার জোগান পাওয়ার বিষয়টা হয়তো এভাবেই দীর্ঘায়িত করতেন।'[৩১]

গায়ক-কবির এই প্রাচীন পেশাটি টিকে আছে আমাদের সময়েও। ১৯৩০ সালে আমেরিকার মিলম্যান প্যারি ও তাঁর শিষ্য আলবার্ট লর্ড প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়ার চারণকবিদের নিয়ে গবেষণা করে প্রমাণ করলেন যে মুসলিম সার্বিয়ার এই চারণকবিরা ('guzlars') আজও প্রাচীন মহাকাব্যিক বাচনিক গাথার ঐতিহ্যকে বুকে ধারণ করে আছে, যে ঐতিহ্য প্রকরণ ও শৈলীর দিক থেকে হোমেরিক এবং যাদের কাব্যে হোমারের মহাকাব্যদুটির মতোই রয়েছে অসংখ্য ফরমুলা বা গৎবাঁধা শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য ইত্যাদি জুড়ে দেবার রীতি। বড় অর্থে প্যারি ও লর্ড এই তত্ত্বই খাড়া করলেন যে, *ইলিয়াড* ও *অডিসি* দূর অতীতে গ্রিক শ্রোতাদের সামনে গাওয়া হত এই এখনকার বলকান চারণকবিরা যেভাবে গায় সেরকম করেই— প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মানুষের মুখে মুখে ঘুরে ফিরেছে তাদের এসব গীতিকাব্য, কোনো লিখিত রূপ নেই ওগুলোর, সবই বাচনিক বা মৌখিক, সবই স্মৃতি থেকে নেওয়া, আর সেইসাথে সামান্য কিছু বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য নিয়ে তারা গান গাওয়ার মতো করে গেয়ে যাচ্ছে এই কবিতা, এবং যেটা গাইছে তার ভেতরেই আবার তাৎক্ষণিক শ্রোতার মন-মরজি বুঝে এবং ছন্দ, সুর ও মাত্রার দাবি মেটাতে ঢুকিয়ে দিচ্ছে আগে থেকে তৈরি করে রাখা ফরমুলা বা গৎবাঁধা শব্দ কিংবা বাক্যবন্ধ।[৩২] আলবার্ট লর্ডের এ কথার অর্থ দাঁড়ায়: আগে থেকে তৈরি করা নানা ফরমুলা, শব্দ বা বাক্যবন্ধ নতুনভাবে ব্যবহার করে, শ্রোতা-দর্শকদের আগে থেকে জানা কিংবদন্তির কাহিনী গেয়ে, এই চারণকবিরা প্রতিবারের গাওয়া বা আবৃত্তির সময়ে একই কাহিনীকে, প্লটের মূল কংকালটা একই রেখে, নতুন নতুন রূপ দিতেন। বাঙালি পাঠককুলের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি, বিখ্যাত আলবেনিয়ান ঔপন্যাসিক ইসমাইল কাদারের উপন্যাস *The File on H*-এ বলকান চারণকবিদের এই কলা ও শৈলীর এক চমৎকার ফিকশনাল বিবরণ রয়েছে। যা-হোক, হোমারের মতো প্রাচীন গ্রিক চারণকবির কাব্যকলার কতটুকু ছিল পাথরে-লেখা বা স্থির, আর কতটুকু প্রতিবারের পারফরমেন্সে ফরমুলা ভাণ্ডার থেকে নিয়ে যোগ করে করে দর্শক-দাবি মেটানো, এবং সেটা মেটানোর সময়ে কীভাবে তাঁরা ঠিক করতেন যে কোন্ কোন্ শব্দ বা বাক্যাংশ তাঁরা ঐ মুহূর্তে ঠোঁটে তুলে আনবেন তাঁদের স্মৃতির সিন্দুক থেকে— এসব প্রশ্নের কোনো পরিষ্কার উত্তর আজ আর কেউ দিতে পারবেন না, মিলম্যান প্যারি বা আলবার্ট লর্ডও না। আমরা শুধু যেটুকু জানি, তা এই: প্রাচীন গ্রিক চারণকবিদের মধ্যে একমাত্র হোমারই মানুষের মননের জগতে চারণগীতিকার হিসেবে সেই জায়গাটা নিতে পেরেছিলেন যা অন্য সবার জন্য ছিল উৎকর্ষের শেষ সীমা, পরশপাথর। প্রাচীন গ্রিসের জনগণের উদ্দেশে জারি করা এক সরকারি প্রজ্ঞাপনে আমরা দেখি যে বলা হচ্ছে: 'দেবী অ্যাথিনার সম্মানে আয়োজিত জুলাই মাসের প্যানআথেনিয়া উৎসবে হোমারের *ইলিয়াড* ও *অডিসি*র পুরোটাই আবৃত্তি করা হবে'।[৩৩] এরকম সম্মান প্রাচীনকালের গ্রিকরা হোমার ছাড়া আর কোনো চারণকবিকে দিয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই। তাই হোমারের যে কোনো তথাকথিত 'জীবনী'ই যে লাখ লাখ সাধারণ গ্রিকের হোমার সম্বন্ধে শোনা নানা গুজব, চিন্তা, কল্পনাকে সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে 'জনপ্রিয়' হয়ে উঠতে চাইবে, তা ভালোভাবেই অনুমান করে নেওয়া যায়। তারপরও, হোমারের এসব 'জীবনী' থাকা সত্ত্বেও, আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না যে

হোমার নামে আসলেই কেউ ছিলেন। টমাস ডি কুইন্সি ১৮৪১ সালে লেখেন: ‘কেউ কেউ বলেন হোমার নামে কখনোই কেউ ছিল না, আর অন্যেরাও আছেন যারা বলেন— ঘটনা বরং উল্টোটাই, হোমার নামে ছিলেন অনেকেই।’[৩৪]

এখানেই ইঙ্গিত আছে এমনতরো এক জনপ্রিয় তত্ত্বের যে, হোমার কোনো ব্যক্তিমানুষের নাম ছিল না, এটা ছিল এক প্রতীকের নাম— চারণকবিদের গান বা পদ্য গাঁথা ও আবৃত্তির ঐতিহ্যের প্রতীক। এই প্রতীকার্থে ‘হোমার’ বলতে গ্রিসের প্রাচীন চারণকবিরা তাদের সবার এক কমন পূর্বপুরুষকেই বোঝাত, যে ছিল তাদের মধ্যে সবার প্রথম ও সবার সেরা। যখন মিলম্যান প্যারি বলকান সেই ‘guzlars’দের জিজ্ঞাসা করলেন যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত চারণকবি কে, তারা সবাই বলল ‘এক মহান প্রাচীনের নাম— আইজাক কিংবা হুসো; কোন্ নামটা সঠিক তা আমরা জানি না, তার জন্ম কোথায় হয়েছিল তা-ও না।...আমাদেরকে যারা তার কথা বলেছে তারাও তাকে দেখেনি।...সবাই শুধু তার কথা লোকমুখে শুনেছে।’[৩৫] হতে পারে হোমারের জন্ম এবং জীবনও এই আইজাক বা হুসোর মতো একই প্রক্রিয়ায় ‘ঘটে গেছে’। হোমার, আইজাক, হুসো এরা সবাই সম্ভবত আমাদের ভেতরকার সংগীত ও কাব্যের প্রতি আবহমানকালের আবেগ ও ভালোবাসাকে তাদের নামের ভেতরে ধারণ করে আছেন, এরা সম্ভবত সংগীত ও কাব্যপ্রেমের বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা ও মানসকল্পনারই সৃষ্ট এক চূড়ান্ত উৎকর্ষের প্রতীকায়িত নাম।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দিকে হোমার গ্রিক সভ্যতার পা ফেলা অঞ্চলের পুরোটা জুড়ে স্পষ্ট স্বীকৃত হয়ে উঠলেন শুধু শ্রেষ্ঠতম কবি হিসেবেই নয়, সেইসঙ্গে এক গুরু হিসেবেও, যাঁর বিশ্ববীক্ষা হয়ে উঠল পুরো গ্রিক জাতিরই পৃথিবীকে দেখার ও বোঝার এক চশমার মতো, আর তা শুধু মানুষের পৃথিবীই নয়, দেবদেবীদের পৃথিবীও। দার্শনিক জেনোফোন লিখলেন: ‘হোমার ও হেসিয়ড দেবতাদের এমন সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যেগুলোকে নশ্বর মানুষেরা চরম জঘন্য ও চরম লজ্জার বলে মনে করে— যেমন, চুরি, পরকীয়া, একে অন্যকে ঠকানো ইত্যাদি।’ হাসির কথা বটে। তবে দেবদেবীদের এই জঘন্য সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই আমরা *ইলিয়াড*-এ দেখি যে মানুষ-যোদ্ধা বা বীরকে তার নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে হচ্ছে, দেবদেবীদের কথামতো চললে তার উপকারের চাইতে অপকারই হচ্ছে বেশি। *ইলিয়াড*-এ আমরা দেখি প্রথম থেকে কীভাবে দেবরাজ জিউস ট্রোজান বীর হেক্টরকে সাহায্য করে যাচ্ছে, দেবতা অ্যাপোলোও করছে তাই; কিন্তু দেবতাদের হিসেবেই যখন সময় এল তখন হেক্টরকে নির্বিচারে, নির্দয়ভাবে পরিত্যাগ করল তারা, সেইসাথে দেবী অ্যাথিনা হেক্টরের ভাইয়ের চেহারা নিয়ে ছদ্মবেশে প্রতারিতও করল তাকে, উৎসাহ জোগাল অ্যাকিলিসের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার, যাতে করে হেক্টর অ্যাকিলিসের হাতে মরে। হোমারের দেবদেবীরা খামখেয়ালিপূর্ণ, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রতারক ধরনের সব চরিত্র। প্রাচীন গ্রিসে সেই দেবদেবীদের পুজো-অর্চনার এক যুগেও হোমার যে পরম পূজনীয় এই অলিম্পাসনিবাসী অমরদেরকে ওসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দান করতে পেরেছিলেন, তার মধ্যে তাঁর সাহসেরও পরিচয় আছে বলতে হবে।

দেবদেবীদের এসব ‘জঘন্য’ আচরণের বিপরীতে হোমারের নশ্বর মানুষেরা এমন সব

কাজের উদাহরণ দেখায় যা কিনা যে কোনো ন্যায়পরায়ণ মানুষের কাছেই মনে হবে 'অনুকরণযোগ্য।' প্রাচীন গ্রিসে তা-ই ছিল ব্যাপারটা। গ্রিক যোদ্ধারা হোমারের মহাকাব্য থেকেই শিক্ষা নিল কী করে যুদ্ধে লড়তে হয়, মানসিক যোদ্ধাচেতনা কী করে সমুন্নত রাখতে হয় আর যোদ্ধায় যোদ্ধায় ভ্রাতৃত্ববোধ থাকাটা কেন জরুরি। প্লুটার্কের ভাষ্য মতে, হোমার থেকেই গ্রিক সামরিক বাহিনী ও সরকারি দপ্তরগুলো শিক্ষা নেয় আগামেমননের ভুল, অ্যাকিলিসের ঔদ্ধত্য, হেক্টরের ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা— নেতৃত্বের এসব নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে; আবার নেস্টরের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, অডিসিয়ুসের বাস্তববুদ্ধি— এসব ইতিবাচক গুণাবলি বিষয়েও। এই প্রেক্ষাপটে গ্রিস ও তার উপনিবেশগুলোয় দেখা গেল হোমারকে বাদ দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পাঠক্রম তৈরি করাই অসম্ভব। আমরা প্লুটার্কের *খরাবং* নামের জীবনীতে দেখি তরুণ আলসিবিয়াদেস (প্লেটোর *রিপাবলিক* যাকে অমর করে রেখেছে) খ্রিস্টপূর্ব ৪৩০ সালে একবার এক স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে শিক্ষকের কাছে হোমারের কোনো একটা বই চাইছে, উত্তরে শিক্ষক যখন বলল হোমারের বই নেই, তখন আলসিবিয়াদেস ওই হতভাগা শিক্ষককে এক ঘুসি মেরে বসল।

হোমার ছাড়া স্কুল কোনো স্কুলই নয়; তার চেয়েও খারাপ যে ওটা এমন এক বিদ্যায়তন যেখানে বিদ্যার 'চরমতম উৎকর্ষকেই' অবজ্ঞা করা হয়।

ইলিয়াডের ঐতিহাসিকতা

চিরকালীন 'হোমেরিক কোশ্চেন' মূলত তিনটি: এক. হোমার নামে কেউ কি আদতে ছিলেন?; দুই. *ইলিয়াড* ও *অডিসি*-র রচয়িতা কে?; তিন. *ইলিয়াড*-এর ঐতিহাসিকতা কতটুকু?

আমরা ইতিমধ্যে (এ বইয়ের 'অনুবাদকের কথা' ও এই 'ভূমিকা' অংশে) প্রথম দুটি প্রশ্ন নিয়ে বেশ কিছুটা আলোচনা করেছি, এ দুয়ের অন্তর্গত উপপ্রশ্নসহ (কী পরিস্থিতিতে ও কীভাবে এই কাব্যগুলি গাঁথা হয়—অর্থাৎ এরা মৌখিক/বাচনিক নাকি লিখিত সৃষ্টি)? এখন সময় এসেছে তৃতীয় বড় হোমেরিক কোশ্চেনটার সামনাসামনি হবার, যেটা ভাঙলে আবার দাঁড়ায় অনেকগুলো প্রশ্ন: অ্যাকিলিস, হেক্টরের মতো এরকম হৃদয়গ্রাহী বীরেরা কি আসলেই বাস্তবে ছিল? ট্রোজান যুদ্ধ কি সত্য ঘটনা? যদি সত্য হয়েই থাকে, তাহলে এর মূল পাত্র-পাত্রী কারা ছিল? প্রাচীন সেই পৃথিবীতে সত্যি কি বর্তমান গ্রিসের সব দ্বীপ, সব ভূখণ্ডের লাখখানেক নেতা ও যোদ্ধা একদিন তুরস্কের ট্রয়ের পথে সমুদ্রযাত্রা করে এক মেয়েকে ফেরত আনার জন্য, আর সে-কারণে দশ বছর ঘর-পরিবার থেকে দূরে থাকে তারা? আগামেমনন কি আসলেই সেই যুগে— যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে তেমন কিছুই ছিল না জাহাজ নামের নৌকায় চড়া আর ঘোড়ার পিঠে ওঠা ছাড়া— অত জন রাজাকে একত্রিত করতে পেরেছিল ট্রয় অভিযানে নামবার জন্য? আর ট্রয় নামের কোনো শহর কি ছিল আদতেই? আর যদি থেকেও থাকে, তাহলে ট্রোজান যুদ্ধের এই কাহিনীকে কোন্ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রেখে বিচার করব আমরা?

প্রথমেই জেনে রাখা ভালো যে এগুলোর একটি প্রশ্নেরও কোনো নিশ্চিত উত্তর আমাদের কারো জানা নেই। ব্যাপারটা ঠিক হোমারের জন্মসালের মতো: হেরোডোটাসের দাবি হোমারের জন্ম তাঁর নিজের জন্মের চারশ বছর আগে, অর্থাৎ ৮৫০ খ্রিস্টপূর্ব সনের কাছাকাছি সময়ে; আর হেরোডোটাসের নাম ব্যবহার করে অন্য আরেক ইতিহাসবেত্তার দাবি হোমার জন্মেছেন খ্রিস্টপূর্ব ১১০২ সনে, অর্থাৎ তথাকথিত ট্রোজান যুদ্ধের ৮২ বছর পরে। এ দুটো তারিখের মধ্যেই তো ২৫২ বছরের ফারাক! নিশ্চয়তাপূর্ণ উত্তরের এই যখন অবস্থা, তখন এটা মেনে নেওয়াই ভালো যে এ সবকিছুই গবেষকদের গবেষণালব্ধ অনুমান মাত্র।

এবার আসা যাক মূল বিষয়ে আর তা শুরু করা যাক প্রাচীন পৃথিবীর প্রধানতম ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটাসকে দিয়ে। খ্রিস্টপূর্ব ৪৯০ সনে এবং আবার ৪৮০ থেকে ৪৭৯ সনের মধ্যে তখনকার দিনের কোনোমতে গড়া গ্রিক নগর-রাষ্ট্রগুলোর এক কোয়ালিশন গ্রিসের মাটিতেই ভণ্ডুল করে দিল শক্তিশালী ও বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের (বর্তমানের ইরান) সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিলাষকে। এই অপ্রত্যাশিত ও চোখ-ধাঁধানো বিজয়কে গ্রিকরা বিশালভাবে উদযাপন করল তাদের স্থাপত্যকলা, সংগীত, নাট্যকলা, ফুলদানি পেইন্টিং, মুরাল ও বাগ্মিতাশিল্পে— সর্বত্রই তারা এ বিজয়ের সঙ্গে তুলনা টানল এর প্রায় সাতশ বছর আগের 'অনুমিত' ট্রোজান যুদ্ধে বিজয়ের। হেরোডোটাস খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি তাঁর *হিস্টোরিজ*-এ লিখলেন 'পারস্যের জ্ঞানী-গুণী মানুষদের ধারণা এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যেকার শত্রুতার শুরু হয় প্রাচীনকালে গ্রিকবাহিনীর স্পার্টার হেলেনকে ফিরিয়ে আনতে ট্রয় শহরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে।'[৩৬] হোরোডোটাসের এ-কথার মধ্যে লুকানো আছে দুটি কথা: ট্রয় যুদ্ধ তাহলে আসলেই হয়েছিল বলে বিশ্বাস করতেন হেরোডোটাস; এবং পারস্যের জ্ঞানী-গুণীদের মতো তিনিও আসলে ভাবতেন যে, এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে চিরকালীন এক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান।

আমাদের হাতে আছে যে *ইলিয়াড*, তার সৌন্দর্য ও গুরুত্ব এতই অপার যে, গ্রিক ইতিহাসের প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসা এশিয়া-ইউরোপ বিষয়ক দ্বন্দ্বমুখর কথাবার্তা কিংবা পশ্চিমাদের প্রাচ্যবাদের (Orientalism) নিরিখে আমরা এই মহান সাহিত্যকর্মটিকে দেখতে চাই না। বাজার-চলতি রাজনৈতিক কথাবার্তার সাপেক্ষে এতবড় ধ্রুপদী সাহিত্যের বিচার করা ঠিক নয় বলেই বোধ হয় আমাদের। কারণ *ইলিয়াড* সভ্যতার সংঘাত বিষয়ক কোনো গাথা নয়, আর শুভ বনাম অশুভের দ্বন্দ্ব বিষয়ক তো নয়ই। পরবর্তীকালের মহাকাব্যগুলোর মতো (ভার্জিলের *ঈনিদ* যার একটি) এই কাব্য মানুষের নৃতাত্ত্বিক, জাতিগত, ধর্মীয় কিংবা আদর্শগত দ্বন্দ্ব ও উচ্চাশাকে তার বিষয়বস্তু করেনি। সত্যি বলতে এখানে কাহিনীর নায়ক যে কে, তা চিহ্নিত করাই তো দূরূহ: গ্রিক অ্যাকিলিস, নাকি ট্রোজান হেক্টর? তারা দুজনেই পাঠকের কাছে সমান আকর্ষণীয়, আবার একইসাথে সমান অপছন্দের। কেউ কেউ বলেন যে, বিজয়ী গ্রিক বীর অ্যাকিলিসের চাইতে ট্রোজান হেক্টরই এখানে পাঠক সহমর্মিতা পায় বেশি। *ইলিয়াড*-এর বীরেরা সব মানুষ, আর মানুষের মনুষ্যত্ব ও মানবিকতাই *ইলিয়াড*-এর বিষয়। এর চরম উৎকর্ষ নিহিত এই সত্যের ওপরে আলো ফেলার মধ্যে যে, সবচেয়ে নিকৃষ্ট শত্রুও মৌলিক অর্থে আমার মতোই একজন মানুষ্র সে-ও খ্যাতি ও মহিমা চায়, চায় অমরত্ব, কিন্তু বাস্তবে সে-ও রোগ-শোক, দুঃখবেদনা ও শেষে

গিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর শিকার। *ইলিয়াড*-এর অন্যতম শক্তি এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাও যে, নশ্বর মানুষেরা কোনোদিন দেবদেবীদের মতো অমর হতে পারবে না, তা তারা যতই চেষ্টা করুক না কেন। এই অস্তিত্ববাদী সত্য ও সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা *ইলিয়াড* আসলেই এশিয়া বনাম ইউরোপ, পুব বনাম পশ্চিম— এসব রাজনীতি, গোত্রদ্বন্দ্ব, জাতিগত দ্বন্দ্বের অনেক ঊর্ধ্বের এক জিনিস। অন্য কথায়, জাতি, রাষ্ট্র, রাজনীতি পেরিয়ে আবহমান মানুষের জীবনের শাশ্বত সত্যগুলো তুলে ধরার চেষ্টাই করেছে *ইলিয়াড*, আর তা করতে গিয়ে ট্রয় অভিযানকে সে সামনে রেখেছে স্রেফ এক প্রচ্ছদপট হিসেবে।

ইলিয়াড-এর ঐতিহাসিকতা নিরূপণের জন্য যে আঞ্চলিক রাজনীতির সংকীর্ণ জায়গা থেকে এর দিকে তাকানো যাবে না, সে কথা বলে নেবার পরে এখন প্রথমেই বলে নিই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা। *ইলিয়াড* গ্রিক কালপর্বে লৌহযুগের (iron age) এক কবিতা, যার ঘটনা আবর্তিত ব্রোঞ্জযুগের (নৎড়হুব ধমব) এক যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। ইতিহাসবেত্তারা ব্রোঞ্জযুগের সেই যুদ্ধের— ট্রোজান যুদ্ধের— সনও নিরূপণ করেছেন তাঁদের পারিবারিক স্মৃতি, মন্দিরের দস্তাবেজ ইত্যাদি ঘেঁটেঃ খ্রিস্টপূর্ব ১১৮৪ সন (এরাতোস্থেনেস), ১২৫০ সন (হেরোডোটাস), এবং ১৩৩৪ সন (ডাউরিস)। তার মানে এখন আমরা যে শতাব্দীকে হোমারের *ইলিয়াড* নির্মিত হওয়ার কাল হিসেবে জানি, তার সঙ্গে *ইলিয়াড*-এ বর্ণিত যুদ্ধের কালব্যবধান প্রায় পাঁচশ বছরের। অতএব, আমাদের এই *ইলিয়াডের* পক্ষে কখনোই সম্ভব নয় কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান হয়ে ওঠা, এমনকি দাদা-পরদাদাদের মুখে শোনা স্মৃতিকথা হয়ে ওঠাও। পাঁচ শ বছর অনেক দীর্ঘ এক সময়! হতে পারে এর শুরুটা হয়েছিল ট্রোজান যুদ্ধে লড়া এবং বেঁচে যাওয়া মানুষদের স্মৃতিচারণার ওপর ভিত্তি করে, এবং তারপর ওগুলোই রূপ নেয় কাব্যে, গল্পে, গানে, আর সেটাই আমরা এখন শুনছি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এই কাহিনী জনপ্রিয় ও বহমান ছিল বলেই। এরই অর্থ দাঁড়ায় এই নিশ্চিত অনুমান যে, আমাদের হাতের এ *ইলিয়াড* ট্রোজান যুদ্ধের পরপরই— দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ খ্রিস্টপূর্ব শতকে— একবারে গাঁথা হয়নি, বরং এটা দীর্ঘ কিছু শতাব্দী ধরে নেওয়া নানা সাংস্কৃতিক উপাদানের মিশেল, যার কংকাল হিসেবে থেকে গেছে অবশ্য ঐ একই ট্রোজান যুদ্ধ। ধারণা হয় যে, এই মহাকাব্যে যেসব বিষয়ের উত্থাপন হয়েছে, সেগুলো ট্রয়ের যুদ্ধে যোগ দেওয়া মূল যোদ্ধাদের চিন্তাভাবনার ফসল ছিল না, ছিল পরবর্তীকালের এক বা একের অধিক মানবসমাজের ওই ট্রোজান যুদ্ধকে একটি প্রতীকী ঘটনা হিসেবে নিয়ে নিজেদের সমাজটা গঠনের ভিত্তি করে কাজে লাগানোর জন্য নেওয়া প্রয়াসের ফসল। আর যদি তর্কের খাতিরে আমরা ধরেও নিই যে, *ইলিয়াড*-এর কাহিনীর শাঁসটুকুকে কাব্যিক রূপ দেওয়া হয়েছিল ট্রোজান যুদ্ধের পরপরই, তবু পরবর্তীকালে এর চূড়ান্ত রূপটা দাঁড়ানোর মাঝে যতগুলো শতাব্দী পার হয়ে গেছে, সেই কালপর্বে নিঃসন্দেহে পরিবর্তন এসেছে এ কাব্যের দৈর্ঘ্য, ব্যাপ্তি, ডিটেল, চরিত্র-চিত্রণ, এমনকি প্লটেরও। আর আমরা জানিই যে, শেষে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে হোমার নামের এক কবি যে চূড়ান্ত *ইলিয়াড*টি কাব্যে গাঁথলেন, তাতে দেখা গেল দশ বছরের ট্রোজান যুদ্ধের মাত্র সামান্যই হাজির আছে, বরং

এটা হয়ে আছে ট্রোজান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে দুই গ্রিক সেনাপতির দ্বন্দ্ব-কলহ এবং শেষে এক গ্রিক বীরের হাতে এক ট্রোজান বীরের হত্যার কাহিনী। দশ বছরের যুদ্ধকে কবির মাত্র পঞ্চাশ দিনের মধ্যে ঘনীভূত করে আনার কারণে এটুকু অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না যে, কবি জানতেন তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলী ট্রোজান যুদ্ধের পূর্বাপর বিষয়ক সব কিছুই জানে, এমনকি তারা সম্ভবত এই একই যুদ্ধ বিষয়ক অন্য আরও কিছু গল্প-গাথাও ইতিমধ্যে শুনেছে।

প্রাচীনকালে গ্রিক ও রোমানদের মধ্যে এ নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না যে হেলেস্পন্ট বা দারদানেল্লাস প্রণালীর কাছে, আনাতোলিয়া অঞ্চলের এক সমতলে, একদিন আসলেই ধনভাণ্ডারে সমৃদ্ধ ট্রয় নামের এক নগর ছিল, আর ট্রয়ের পাশ দিয়েই যাওয়া যেত কৃষ্ণসাগর এবং ভেতরের অন্য অনেক সমৃদ্ধ ভূখণ্ডের দিকে। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে গ্রিক থেকে আসা অভিবাসীদের উত্তর-পুরুষেরা আসলেই ঐ স্থানটিতে, প্রাচীনকালের ধ্বংসস্তূপের ওপরে, নতুন এক শহর বানালেন এবং তার নাম দিলেন 'ইলিয়ন'— যে নামটা আগেই ব্যবহৃত হয়েছে ট্রয়ের প্রাচীন নাম হিসেবে, আর যে নামটা থেকেই এসেছে *ইলিয়াড* শব্দটি। এর পরের ইতিহাস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে নামিদামি রাজা-রাজন্যেরা— যেমন পারস্যের রাজা জারজেস (Xerxes), আলেকজান্ডার দি গ্রেট, জুলিয়াস সিজার প্রমুখ— বহুবার এই শহরটি দেখতে গেছেন এমন বিশ্বাস বুকে নিয়ে যে, হেক্টর ও অ্যাকিলিসের সেই পুরনো শহরটিকেই যেন তাঁরা দেখছেন দু চোখ ভরে। খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ সনের বসন্তে পারস্যের রাজা জারজেস ইলিয়নের দেবী অ্যাথিনার নামে এক হাজার ষাঁড়ের পশুবলিও দেন, আর তখন তাঁর যাজকেরা *ইলিয়াড*-এর 'বীরদের' উদ্দেশে মদ ঢেলে পূজাও সম্পন্ন করে। এই ঘটনার পেছনে জারজেসের কী মোটিভ ছিল এবং তিনি কোন্ পক্ষের মৃত যোদ্ধাদের প্রতি পূজা উৎসর্গ রেখেছিলেন (গ্রিকপক্ষ নাকি ট্রোজানপক্ষ), সে বিষয়ে হেরোডোটাস তাঁর *হিস্টোরিজ*-এ কোনো অনুমান করেননি। মূল ব্যাপার এটাই যে, যুগ যুগ ধরে রাজা ও সম্রাটেরা এই ইলিয়ন শহর দেখতে গেছে তাঁদের রাজকর্মের সঙ্গে ঐ মহান অতীতের রাজকর্মের যোগ ঘটানোর মানসিক তৃপ্তিটুকু নেবার স্বার্থেই। আর রোমানদের তো ট্রয়কে পুজো করার আরও বড় এক কারণ ছিল: কিংবদন্তিতে আছে, এ যুদ্ধে অংশ নেওয়া ট্রোজান বীর ঈনিয়াসই ট্রয় ধ্বংস হওয়ার পরে দলবল নিয়ে ইতালি গিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটায়। প্রথম রোমান সম্রাট অগাস্টাস, খ্রিস্টপূর্ব ২০ সালে, সাম্রাজ্যের আদি প্রতিষ্ঠাতা ঈনিয়াসকে সালাম জানাতেই যেন এই ইলিয়ন শহর ভ্রমণে গেলেন। তার আগে জুলিয়াস সিজার এবং তার তিন শতাব্দী পরে সম্রাট কনস্টানটিন, দুজনেই পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তাঁরা ইলিয়নে এক নতুন রোমান রাজধানী প্রতিষ্ঠা করবেন।

খ্রিস্টপূর্ব কাল বাদ দিয়ে এবার আসি খ্রিস্টাব্দের কথায়। পঞ্চম খ্রিস্টাব্দে বর্বর উপজাতিদের আক্রমণের মুখে পতন হল রোমান সাম্রাজ্যের, কিন্তু ইলিয়ন টিকে ছিল তখনও। তবে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে জায়গাটি পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকল বর্তমান তুরস্কের এক কোণায়— অবহেলায়, অযত্নে; এবং এই মধ্যযুগেই দেখা গেল শেষমেশ 'ট্রয়' নামের শহরটি হারিয়ে গেছে মিথ ও কল্পকাহিনীর ঘন কুয়াশার মাঝে। অন্যদিকে ঠিক ওই সময়েই কিন্তু পুবের রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বাইজেনটিয়ান

পণ্ডিত, গবেষক ও লিপিকাররা ব্যস্ত *ইলিয়াড*-এর সম্পাদনা, চূড়ান্ত রূপ, ছাপা এসব নিয়ে। যা হোক, প্রায় ছয়শ বছরের নৈঃশব্দের পরে, অষ্টাদশ শতকে চালু হল পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বেড়াতে যাবার ফ্যাশন, আর তখন বনেদি লেডি মেরি ওর্টলে মন্টাগু এবং তাঁর সঙ্গী রবার্ট উড (১৭১৬-১৭৭১) ট্রোয়াড অঞ্চলে বেড়িয়ে আসার পরে লিখলেন যে, তাঁরা *ইলিয়াড*-এর ট্রয় শহরটিকে অবিকল ও অবিকৃত অবস্থায় খুঁজে পেয়েছেন। লেডি মন্টাগু তো উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জানালেন: 'আমি ওই উপত্যকার দিকে চোখ রেখে রোমাঞ্চিত হয়েছি, যেখানে আমি কল্পনা করে নিয়েছি যে লড়েছিল প্যারিস ও মেনেলাস, আর যেখানে একদিন দাঁড়িয়ে ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শহরটি।' তাঁরা দুজনেই জানালেন, *ইলিয়াড*-এর ভূগোলের সঙ্গে বর্তমান জায়গাটার ভূদৃশ্যের পুরো মিল তারা খুঁজে পেয়েছেন, এমনকি *ইলিয়াড*-এ বর্ণিত বাতাসের দিক, পাহাড়-পর্বত, সমতলের চিত্র, নদী, এসবকিছুরও।

এরকম স্বচক্ষে দেখে লেখা অভিজাত এক লেডির বর্ণনার পরেও ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ গবেষক সন্দেহপরায়ণ থেকে গেলেন গ্রিক 'বীরের যুগের' ওইসব গল্পকথার পেছনে সত্যিকার ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা ছিল কি-না, সে সম্বন্ধে। ব্রিটিশ ইতিহাসবেত্তা জর্জ গ্রোটে (১৭৯৪-১৮৭১) তাঁর বারো খণ্ডের *হিস্ট্রি অব গ্রিস* বইয়ে জানালেন, খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ সনটি হচ্ছে (অর্থাৎ অলিম্পিক গেমস শুরু হওয়ার বছরটি) প্রাচীন গ্রিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হওয়ার প্রথম বছর। তাঁর এ বইয়ের প্রথম দু খণ্ড প্রকাশ হওয়ার (১৮৪৬) ত্রিশ বছরের মধ্যেই দেখা গেল তিনি ভুল বলেছিলেন: হোমারের মহাকাব্য দুটো, যাদের তিনি ঐতিহাসিক কোনো সাক্ষ্য হিসেবে ধর্তব্যেই নেননি, আবির্ভূত হল অতীতের অকাট্য দলিল হিসেবে। গ্রোটে যে বছরটিকে বলেছেন গ্রিক ইতিহাসের শুরুর বছর, দেখা গেল তার সাতশ বছর আগের এক গ্রিসও হোমারের কাব্যদুটোয়— ভালোভাবেই সমাজ ও সময়কে সঙ্গে নিয়ে— ভাস্বর হয়ে আছে। এর পরে শৌখিন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ও হোমারপ্রেমীরা—গবেষকরা নন—দল বেঁধে এগিয়ে এল *ইলিয়াড*-এর ঐতিহাসিকতা নিরূপণে। প্রথমে ফ্র্যাংক কালভার্ট (১৮২৮-১৯০৮), যিনি তুরস্কের পশ্চিমের দারদানেল্লাস প্রণালী সংলগ্ন এই অঞ্চলে চাকরিসূত্রে ও ব্যবসায়ে বহু বছর কাটিয়ে অঞ্চলটি নিবিড়ভাবে নিরীক্ষা করে দাবি তুললেন যে, হিসারলিক শহরই হোমারের ট্রয়। এই কালভার্টই পরে, ১৮৬৮ সালের আগস্ট মাসে, তাঁর তত্ত্বগুলো শোনালেন জার্মান অভিযাত্রী ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী হেইনরিখ শ্লিয়েমানকে (১৮২২-১৮৯০)। শ্লিয়েমানই ১৮৭১-র অক্টোবর থেকে শুরু করে পরের দুবছর নিরন্তর খুঁড়ে গেলেন হিসারলিকের বিশাল মালভূমিসদৃশ ঢিবি, যতদূর নিচ পর্যন্ত পারা যায়। কিন্তু তিনি যেহেতু প্রশিক্ষিত কোনো প্রত্নতত্ত্ববিশারদ ছিলেন না, তাই তাঁর হাতে ঢিবির অপেক্ষাকৃত ওপরের অংশে পাওয়া অনেক চিহ্ন, ইঙ্গিত, নিদর্শন নষ্টই হল শুধু, এবং তিনি এ বিষয়ক জ্ঞানের স্বল্পতা হেতু সেসবের কোনো বিবরণও লিখে রাখলেন না। কালভার্ট শ্লিয়েমানের পাওয়া পাথরের অলংকার (ব্রোঞ্জের নয়) দেখে এসময় মন্তব্য করলেন যে, শ্লিয়েমান কথিত 'প্রায়ামের শহর'টি আসলে আরও আদি কোনো সময়ের এক শহর। যা হোক, প্রথম দিকে ধাক্কা খেয়ে, ঠেকে শিখে, শ্লিয়েমান এবার এগিয়ে এলেন নতুন করে। ১৮৯০ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত, এরপর ১৮৯৩-১৮৯৪ সালে তাঁর উত্তরাধিকার ভিলহেলম্

ড্রপফেল্ডের হাত ধরে, এবং শেষে দীর্ঘ কয়েক দশকের বিরতির পরে, ১৯৩২-১৯৩৮ সালে আমেরিকান প্রত্নতত্ত্ববিদ কার্ল ব্লেজেনের তত্ত্বাবধানে হিসারলিকের খনন চলতেই লাগল। সব শেষে উন্মোচিত হল মোট নয়টি স্তর (যাদের নাম দেওয়া হল ট্রয়-১ থেকে ট্রয়-৯) এবং প্রায় পঞ্চাশটি উপ-স্তর। ট্রয়-১, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বললেন, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ সনের শহর; আর ট্রয়-২ যাকে শ্লিয়েমান ভেবেছিলেন *ইলিয়াড*-এর ট্রয়, দেখা গেল ট্রোজান যুদ্ধের এক হাজার বছর আগের। অবশেষে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা জানালেন যে শ্লিয়েমান-ড্রপফেল্ড-ব্লেজেনের খনন করা ট্রয়-৬ কিংবা ট্রয়-৭ ও ৭ক-ই, সম্ভবত, হোমারের *ইলিয়াড*-এর ট্রয়। তাঁরা এই অনুমানে পৌঁছালেন খনন করে পাওয়া ভূদৃশ্যের সঙ্গে *ইলিয়াড*-এ বর্ণিত ইলিয়াম শহরের পরিগঠন ইত্যাদি মিলিয়ে এবং খননের স্থানে লব্ধ নানা অস্ত্রপাতি, অলংকার, থাম ও অন্যান্য বস্তু নিয়ে গবেষণা করে। আমরা যদি তুরস্কের পশ্চিমের দারদানেল্লাস প্রণালীর নিকটবর্তী শহর এই হিসারলিককেই হোমারের ট্রয় বলে ধরে নিই, যেহেতু পৃথিবীর সেরা প্রত্নতাত্ত্বিকেরা শ্লিয়েমান-ড্রপফেল্ড-ব্লেজনের খনন অভিযানের পরে সে কথাই বলছেন, তাহলে অন্য আরও কিছু জিনিস বিবেচনায় নিয়েই কেবল আমরা আশ্বস্ত হতে পারি যে, আমরা ঠিক জায়গাটিকেই ট্রয় হিসেবে ধরেছি। প্রত্নতত্ত্বের বাইরে এগুলো ভূগোলের এবং পৃথিবীর সামরিক ও বাণিজ্যিক ইতিহাসের বিষয়।

ইতিহাস বলে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে আনাতোলিয়া অঞ্চলের (বর্তমান তুরস্ক) প্রধান রাজনৈতিক শক্তি ছিল হিট্টাইট সাম্রাজ্য (Hittite Empire), যার কেন্দ্র বা রাজধানী ছিল হাত্তুসা (Hattusa; বর্তমান আংকারার কাছের বোগাস্‌কয় শহরটি)। প্রত্নতত্ত্ব এবং প্রাচীন হিট্টাইট ভাষা নিয়ে গবেষণা থেকে ইতিহাসবেত্তারা এটুকু নিশ্চিত হয়েছেন যে হাত্তুসাকেন্দ্রিক এই সাম্রাজ্য যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল আর তাদের ক্ষমতার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল বর্তমানের সিরিয়া-লেবানন অঞ্চল থেকে একদম মিশর পর্যন্ত।

ট্রয় ছিল এই হিট্টাইট সাম্রাজ্যেরই এক অধীন রাজ্য। হিট্টাইট অফিশিয়াল দলিল দস্তাবেজে দেখা মেলে দুটি শহরের নামেরঃ Taruwisa I Wilusa, যা বেশ মিলে যায় হোমার-উল্লিখিত দুই গ্রিক নামের সঙ্গেঃ Taruwisa-র সঙ্গে Troy; Wilusa-র সঙ্গে Ilios। লক্ষণীয় যে, ট্রয়ের নাম হিসেবে হোমার তিনটি নাম ব্যবহার করেছেন তাঁর মহাকাব্যেঃ ইলিয়স বা ইলিয়ন, ইলিয়াম এবং ট্রয়। আর হিট্টাইট রাজার এক চুক্তিনামার মধ্যে পাওয়া গেছে ভিলুসার আলাকসান্দুকে (Alaksandu of Wilusa) সাহায্য-সমর্থন দেবার কথা। গবেষকদের অভিমত, এই লোকই ইলিয়সের আলেকজান্ডার (Alexander of Ilios) বা ট্রয়ের আলেকজান্ডার (পাঠক জানেন, আলেকজান্ডার ছিল ট্রোজান যুবরাজ প্যারিসের অন্য নাম; *ইলিয়াড*-এ প্যারিসকে আলেকজান্ডার নামেই হোমার ডেকেছেন অধিকবার)। সর্বোপরি হিট্টাইট অফিশিয়াল কাগজপত্রেই আছে আহিইয়াবা (Ahhiyawa)-দের কথা, যারা, গবেষক ও ভাষাতাত্ত্বিকদের সিদ্ধান্ত, হোমারের আখাইয়ান (Achaioi) বাহিনী বা আধুনিক অর্থে গ্রিকবাহিনী।

ট্রয় নিশ্চিত এই হিট্টাইট রাজ্যের খুব গুরুত্বপূর্ণ এক মিত্ররাজ্য ছিল। কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে আনাতোলিয়ার পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রপাড়ের এই শহর নিশ্চয়ই বাণিজ্যের দিক থেকে বিরাট গুরুত্ব রাখত। আর তাই এরকম গুরুত্বপূর্ণ এক

শহরের ওপরে ভিনদেশি শক্তির আক্রমণ সহজেই আরও অনেক মিত্ররাজ্যকে ভিনদেশি বাহিনীর বিপক্ষে একত্রিত করেছিল। *ইলিয়াডে*ই আছে যে, ট্রোজান যুদ্ধে মিত্ররাজ্যগুলো থেকে আসা সৈন্যদের সংখ্যা ট্রয়ের সৈন্যসংখ্যার চাইতে বরং বেশিই ছিল, আর তারা কথা বলতো নানা ভাষায় (*ইলিয়াড*—২:৮০৩-৮০৪)।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতকে কেন এই হিট্টাইট সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য ট্রয় আক্রান্ত হয়েছিল তার বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়েছে। সেসময় ঈজিয়ান সাগর তীরবর্তী অঞ্চলে বিরাটাকারে মানুষের চলাচল ও বসতিস্থাপন হঠাৎ থেমে যায়, অনেক বৃহৎ বসতিই 'ব্যর্থ রাজ্য' হয়ে পড়ে। হতে পারে ভিলুসা বা ট্রয় এগুলোরই একটা ছিল। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প, শস্যের ফলন না হওয়া, বা সমুদ্র তীর থেকে ভেতরের দিকের অঞ্চলগুলোর চাপ— এর যে কোনো একটাও হতে পারে ট্রয়ের বিলুপ্ত হবার কারণ। ওই যুগের মিশরীয় খোদাই করা হস্তলিপিতে দেখা যায় 'সমুদ্রচারী দস্যুদের' (Sea People) কথা বলা হচ্ছে। হতে পারে, সমুদ্র তীরবর্তী নামকরা শহর ট্রয় গুঁড়িয়ে দিয়েছিল এই 'সি পিপলরাই'। আবার অন্য দিকে এটাও সত্যি যে ঈজিয়ান অঞ্চলে তখনকার দিনে নিয়মিতই অভিযান চালাত গ্রিস থেকে সাগর পেরিয়ে আসা যোদ্ধা, অভিযাত্রী, দস্যুরা। ঈজিয়ান অঞ্চল জুড়ে সেসময় গ্রিক সভ্যতা যে তার প্রচণ্ড আমলাতান্ত্রিক ও রাজপ্রাসাদ-কেন্দ্রিক সংস্কৃতির প্রবল বিস্তার ঘটিয়েছিল, ইতিহাসবেত্তারা বলেন যে তা এখন আর কোনো বিতর্কের বিষয় নয়। এখানে আবারও শ্লিয়েমানকেই আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে। তিনি ১৮৭৬ সালে গ্রিসের মাইসিনির (মাইকেনাই; *ইলিয়াড*-এ আগামেমননের শহর) প্রাচীন নগরদুর্গে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজ চালিয়ে প্রচুর কবরের সন্ধান পান, যেগুলোর অভ্যন্তরে পাওয়া যায় অনেক প্রাচীন কালের বস্তুসামগ্রী, মৃতদেহ কবরস্থ করার সোনায়-বানানো মুখোশ সহ। শ্লিয়েমান বিশ্বাস করতেন, তিনি রাজা আগামেমনন ও রানি ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রার চিরশয্যার স্থানটাই খুঁজে পেয়েছেন। যাই হোক, শ্লিয়েমানের এই আবিষ্কার প্রমাণ করল যে খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০ থেকে ১১০০ সালের দিকে গ্রিকরা রাজপ্রাসাদ-কেন্দ্রিক এক সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়েছিল পুরো বৃহত্তর গ্রিস অঞ্চল জুড়ে, তুরস্কের আনাতোলিয়া ছিল যার অন্তর্গত। এসময়ই, লক্ষ রাখতে হবে, ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় ব্রোঞ্জযুগের ইতি ঘটে। এই রাজপ্রাসাদ-কেন্দ্রিক সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গেছে এমন সব রাজ্যের জন্য প্রযোজ্য সভ্যতাকেই এখন ইতিহাসে বলা হয় 'মাইসিনিয়ান (বা মাইকেনিয়ান) সভ্যতা'। এদের মধ্যে আছে: থিবজ্‌, অরকোমেনোস, আথেন্স, টিরিন্‌জ, স্পার্টা, পাইলোস— সবকটিই *ইলিয়াড*-এ উল্লিখিত শহর। এদেরই কোনো একটির, বা এরা সবাই মিলে, ঈজিয়ান সাগরতীরের ভিলুসা বা ট্রয় দখলের জন্য নেমে যাওয়া বিচিত্র নয়। আর সেই নামার পেছনের কারণ হতে পারে সাম্রাজ্যবাদী কিংবা রাজনৈতিক, হতে পারে হেলেন নামের স্পার্টার রানির অপহরণকেন্দ্রিক।

শেষ কথা এটাই যে, ইতিহাসবেত্তারা এখন মনে করেন এশিয়া মাইনর অঞ্চলে হিট্টাইট সাম্রাজ্যের আমলে, বর্তমানের হিসারলিক শহরের স্থানটিতে, আসলেই এক বড় ও সমৃদ্ধশালী শহর ছিল যা মাইসিনিয়ান গ্রিকদের হাতে অবরুদ্ধ ও যুদ্ধে পরাজিত হয়। কেন

এটা ঘটেছিল এবং এর পরে কী হয়েছিল ওই হিসারলিকে, তা আমাদের কাছে অস্পষ্ট, একইরকম অস্পষ্ট এ যুদ্ধের আগের ও পরের 'নিখুঁত' কালপঞ্জিও। ট্রয়ে বিজয়ী মাইসিনিয়ান গ্রিকরা কি ছিল মাইসিনিয়ান রাজপ্রাসাদ-কেন্দ্রিক সভ্যতার পতনের পরে, গ্রিসের মূল ভূখণ্ড থেকে জাহাজে চড়ে আসা, অন্য রাজ্য দখল করে টিকে থাকতে চাওয়া অভিযাত্রী বা দস্যুদের দল? তারা কি বিশেষভাবে চোখ রেখেছিল কৃষ্ণসাগরের দিকে যাওয়ার সময়ে হাতের ডানদিকের (পুবের) ওই উঁচু দেওয়াল ঘেরা শহর এবং এর ধনসম্পদ ও প্রাচুর্যের দিকে? দীর্ঘ দশ বছরব্যাপী চলা ওই ভিলুসা বা ট্রয় অভিযানই কি মাইসিনিয়ান সাম্রাজ্যের পতন তরান্বিত করেছিল— সব রাজাদের মূল দেশ থেকে সৈন্য সামন্ত নিয়ে দূরে অবস্থানের কারণে এবং এক লক্ষ সৈন্যের বাহিনীর জন্য দশ বছর ধরে খাদ্য-পোশাক-অস্ত্রপাতি ইত্যাদির জোগান দেবার দুঃসাধ্য কাজটার চাপের মুখে পড়ে? আর গ্রিকদের এই ঈজিয়ান সাগরবর্তী ট্রোয়াড অঞ্চলে আক্রমণের ঘটনা কি ঘটেছিল একের অধিক অনেকবার, যেগুলোকে পরে মানুষ গল্প বলার সহজতার স্বার্থে একত্রে যোগ করে নাম দিয়েছিল 'ট্রোজান যুদ্ধ'? এশিয়া মাইনরের এই সমুদ্র উপকূলে গ্রিকদের আক্রমণ আর পরবর্তীকালে এ অঞ্চলেরই গ্রিক উপনিবেশে রূপান্তর হয়ে যাওয়ার মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে কোনো? আর হাত্তুসার হিট্টাইট সাম্রাজ্যেরও তথাকথিত ঐ ট্রোজান যুদ্ধের সময়েই (খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ সালের দিকে) বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণ কী হতে পারে? ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মান এখন দিন দিন যেভাবে বাড়ছে, সেসব গবেষণার পেছনে কর্পোরেট জগতের অর্থায়নও যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং পৃথিবীব্যাপী হোমার ও হোমারের দুই মহাকাব্য আর 'ট্রোজান-যুদ্ধ' বিষয়ক জনমানুষের আগ্রহও যেভাবে উপরের দিকেই ধেয়ে চলেছে, তাতে আমাদের অনুমান হয় যে, এ সব প্রশ্নের মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য উত্তর পাওয়া যাবে আগামি কয়েক দশকের মধ্যেই।

পাঠককে শুধু জানিয়ে রাখি, তুরস্কের হিসারলিক এখন ট্যুরিস্টদের কাছে প্রবল জনপ্রিয় এক স্থান। ইস্তাম্বুল নেমে বাসে বা ট্রেনে করে সারা পৃথিবীর মানুষেরা এখন সেখানে যায় আর শ্লিয়েমানের খনন করে পাওয়া 'ট্রয়ের নগর-দেওয়ালের' গায়ে হাত রেখে ছবি তোলে। আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে, যতই এ স্থানটির হোমারের ট্রয় হওয়া নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হোক না কেন, সারা পৃথিবীর ট্যুরিস্টরা হিসারলিকের এই প্রাচীন নগর-দেওয়ালে হাত ছুঁইয়েই, শতভাগ নিশ্চয়তার সঙ্গে, চোখ বুঁজে এক মুহূর্তের জন্য হলেও ভাবেন যে তাঁরা সেই দেওয়ালই ছুঁয়ে আছেন যা বেড় দিয়ে অ্যাকিলিস ও হেক্টর তিন বার দৌড়ে গিয়েছিল *ইলিয়াড*-এর শেষ ভাগে, হেক্টরের মৃত্যুর কিছু আগে। ট্যুরিস্ট গাইডবুকগুলো থেকে আমরা জানি, অনেক ট্যুরিস্ট তখন এমনকি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যান, চোখের জল ফেলেন হেক্টরের কথা মনে করে, কিংবা তিন হাজার বছর আগের প্রাচীন পৃথিবী থেকে আসা হাওয়ার ঝাপটার সামনে দাঁড়িয়ে।

ইলিয়াডের থিম ও কাব্যশৈলী

এ বইয়ের শেষে দীর্ঘ 'পাঠ-পর্যালোচনা' অংশে এবং শুরুতে 'অনুবাদকের কথা' ও প্রতিটি পর্ব আরম্ভের আগে 'প্রবেশিকা' অংশগুলোয় *ইলিয়াড*-এর থিম নিয়ে এত কথা বলা

হয়েছে— একই সঙ্গে হোমারের কাব্যের শৈলী ও প্রকরণ নিয়েও কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে নানা স্থানে— যে সেসবের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে বইটির আকার অকারণে বড় করতে চাচ্ছি না। এখানে কেবল, সুচিন্তিতভাবে, সেসব কথাই বলা হল যা সম্ভবত আমি ইতিমধ্যে অন্য কোনো অংশে বলে ফেলিনি।

প্রথমে আসি *ইলিয়াড*-এর থিম বিষয়ে। অ্যাকিলিসের দুই স্তরের দুই ক্রোধই *ইলিয়াড*-এর থিম— প্রথম পর্যায়ে রাজা আগামেমননের প্রতি ক্রোধ, যার পরিণতি তার প্রিয় বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যু; আর দ্বিতীয় পর্যায়ে হেক্টরের প্রতি ক্রোধ, যার পরিণতি অ্যাকিলিসের হাতে হেক্টরের মৃত্যু, যার আবার শেষ পরিণতি— নিয়তির পূর্বনির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী ইলিয়াড-উত্তর কালে— অ্যাকিলিসের নিজের মৃত্যু। এই মহাকাব্য তার কেন্দ্রমূলে অ্যাকিলিসের জন্য ধারণ করে আছে একটি বড় প্রশ্ন: এই জীবন যাপনের অর্থ কী? অ্যাকিলিসের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এর অর্থ তিনটি:

এক. যুদ্ধে নেমে বীরের খ্যাতি বা kleos অর্জন করা, যে গ্রিক শব্দ kleos-এর ব্যঞ্জনাগত অর্থ মৃত্যু-পরবর্তী কালের খ্যাতি ও মহিমা। বীর তার পরাজয় ও অপমানকে *ইলিয়াড*-এ দেখে পৃথিবীতে মানুষের পক্ষে পাওয়া সম্ভব এমন সবচেয়ে বড় দুই নেতিবাচক অর্জন হিসেবে।

দুই. বীরেরা কোনো আগে থেকে প্রোগ্রামিং করা মেশিন নয়, তারা রক্তমাংসের মানুষ; যদি পারত তাহলে তারা লড়াই এড়িয়ে বরং স্ত্রী-পরিবার নিয়ে সুখের সংসার গড়েই দিন কাটিয়ে দিত। *ইলিয়াড*-এর সামরিক জগৎটিতে ব্যর্থতার মানেই যেহেতু মৃত্যু, হোমার তাই মৃত্যুকে এখানে অযথা মরার-জন্য-মরা অর্থে মহিমান্বিত করেননি। *ইলিয়াড*-এর বীরেরা কেউই মরতে চায় না। গ্রিকরা যেমন চায় দেশে ফিরে যেতে, ট্রোজানরাও তেমনই চায় এ-যুদ্ধের শেষ হোক। হেক্টর-অ্যান্ড্রোমাকি-অ্যাস্টায়ানাক্সের সাক্ষাতের দৃশ্যে হোমার বীরের অবিনশ্বর মহিমাকে এক আরও বড় প্রেক্ষাপট থেকে, ঘর-সংসার-পরিবারের জীবনের সাপেক্ষে, দেখেছেন। কিন্তু এ সমস্ত কোনো কথাই অ্যাকিলিসের জন্য প্রযোজ্য নয়। অ্যাকিলিসই *ইলিয়াড*-এর একমাত্র বীর যে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গিয়ে সাধারণ মানুষের দীর্ঘ জীবন চায় না, বরং যুদ্ধে নেমে মৃত্যুবরণ করে বীরের মহিমায়-পূর্ণ ক্ষণস্থায়ী জীবন চায়। অ্যাকিলিস এখানে যে সমস্যাটার মুখোমুখি হয়, তা অনেকটা এমন: সে যেহেতু জানে যে তার জীবন সংক্ষিপ্ত হিসেবে নিয়তিনির্ধারিত হয়ে আছে, সেহেতু সে এটাও জানে যে অনন্তকালের খ্যাতি অর্জনের প্রয়াস নেওয়ার পক্ষে তার হাতে সময় অনেক কম। তাই জীবন তার কাছে দীর্ঘ নয়, কিন্তু প্রগাঢ়, তীব্র কিছু। তার কাছে জীবন যাপনের অর্থ তীব্রতা ও প্রচণ্ডতা নিয়ে জীবনকে যাপন করা।

তিন. অ্যাকিলিসের কাছে মানুষের জীবনের আরেকটা সোজাসাপটা অর্থ প্রিয় বন্ধুর হত্যাকারীকে খুন করে প্রতিশোধ নেওয়া। এই প্রতিশোধ নিতে গিয়েই, অর্থাৎ তার নিজের জীবনকে অর্থ দিতে গিয়েই, অ্যাকিলিস তার জীবনের সমাপ্তির চুক্তিনামায়ও স্বাক্ষর দিয়ে বসে। তবে অ্যাকিলিস যে হেক্টরকে খুন করে বন্ধুহত্যার প্রতিশোধ নিতে চাইছে স্রেফ বীরের খ্যাতি অর্জনের জন্য, ব্যাপারটা তেমন নয়। তেমন যদি হত তাহলে হোমারকে আমরা এত

মহান এক কাব্যকার বলতাম না। ব্যাপারটা হচ্ছে, শ্রেষ্ঠতম ট্রোজান বীরকে হত্যা করে নিজের বন্ধুহত্যার প্রতিশোধ নিয়ে বীরের মহিমা অর্জনের পাশাপাশি অ্যাকিলিস এ কাজটা করতে চাইছে তার নিজের ভেতরকার অপরাধবোধ থেকেও, কারণ সে প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর জন্য নিজেকেই দোষী ও দায়ী হিসেবে দেখছে। এখানেই বোঝা যায়, হোমারের এই বীর 'যান্ত্রিক' বা গৎবাঁধা কোনো বীর নয়, সে নিতান্তই মানুষ এক বীর, যার মধ্যে ভালো-মন্দ-ন্যায়-অন্যায় ও দায়িত্ববোধের নৈতিক বিষয়গুলো পুরোদমেই কাজ করছে। আবার এরই বিপরীতে, যে পাশবিকতা নিয়ে অ্যাকিলিস হেক্টরকে হত্যা ও তার লাশের প্রতি লাঞ্ছনাগুলো করল, তাতে করে আমরা বুঝলাম হোমারে শেষ কথা বলে কিছু নেই— মানবিক অ্যাকিলিস এখানে আবার একটা পশুও। এ-পর্যায়ে এমনকি দেবতারাও একমত হল যে, অ্যাকিলিস আসলে একটা সিংহ, সে দয়ামায়া ও মানুষের চোখের পর্দা বলতে যা বোঝায়, সবকিছুকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এরই পরে আবার হোমারের মোড় পরিবর্তন। অ্যাকিলিস যেভাবে হেক্টরের পিতা প্রায়ামের অনুরোধ মেনে নিয়ে পিতার হাতে পুত্র হেক্টরের লাশটি তুলে দিল, তাতে করে, শুধু তাতে করেই, *ইলিয়াড* আলাদা হয়ে গেল পৃথিবীর বাকি আর সব মহাকাব্যিক গাথা থেকে। পুরো অন্য এক উচ্চস্তরে উঠে গেল এই কাব্য। অ্যাকিলিসই আমাদেরকে শেষমেশ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, জীবন প্রতিশোধস্পৃহার পূরণের চাইতেও বেশি কিছু, আর যোদ্ধার পুরুষত্ব ও বীরত্ব আসলে স্রেফ মানুষ খুন করে যাওয়ার চাইতে অধিক বড় কোনো সত্য।

এই-ই *ইলিয়াড*— পৃথিবীর প্রথম 'ট্র্যাজেডি'। বিখ্যাত গ্রিক ট্র্যাজিক নাট্যকারেরা 'ট্র্যাজেডি' নামের সাহিত্যিক প্রকরণটি উদ্ভাবনের কমপক্ষে দুশো বছর আগেই হোমার 'ট্র্যাজেডি'-র অভ্যন্তরস্থ সব স্বভাবকেই বুঝে ফেলেছিলেন। তিনি প্যাট্রোক্লাসের চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রথম ফুটিয়ে তোলেন 'ট্র্যাজেডি'র টানাপড়েন; আর পরে আরও দারুণভাবে সেই কাজটা করেন অ্যাকিলিসের চরিত্রটি নির্মাণ করে— প্রথমে অন্যায়ের শিকার এক বীর, যার জন্ম আবার এক দেবীর গর্ভে, যে শেষে গিয়ে দেখে তার নিজেরই নেওয়া সিদ্ধান্তের কারণে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে তার জীবনের সব শান্তি, মারা গেছে তার প্রিয় বন্ধু প্যাট্রোক্লাস, আর তখন সে তার নিজের দায়দায়িত্ব এড়াতে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে জেনেশুনে এগিয়ে যায় নিজের জীবনেরই ইতি টেনে দেওয়ার দিকে। হোমারই গ্রিক ট্র্যাজেডিয়ানদের দেখিয়ে দিলেন যে সামনের শতাব্দীগুলোয় মঞ্চে কী রকম ট্র্যাজেডি মঞ্চস্থ হতে পারে।

হোমারের কাব্যশৈলী বিষয়ে অতি সংক্ষেপে এটুকুই বলতে হয় যে, তিনি প্রচণ্ড 'সংযমী'। তিনি খুব ভালোমতো জানেন নিজের আবেগকে কী করে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, এবং তিনি 'অবজেকটিভ'— কোনো ক্যামেরার মতো করেই তিনি পুরো দৃশ্যটা দেখে নিচ্ছেন আগাপাশতলা, কিন্তু রায় দিচ্ছেন না কোনোকিছু নিয়েই। হোমারকে 'সংযমী' বলার জন্য একটা উদাহরণই যথেষ্ট। এ-মহাকাব্যের শেষতম পর্বে হোমার বিদায় দিলেন তার কাহিনীর প্রধান নায়ক অ্যাকিলিসকে। আমাদের দেখানো হল যে অ্যাকিলিস ঘুমিয়ে পড়েছে তার বাহুতে ব্রাইসিয়িস নামের নারীকে জড়িয়ে ধরে, এ সেই একই ব্রাইসিয়িস যাকে মহাকাব্যের প্রথম পর্বে রাজা আগামেমনন অ্যাকিলিসের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে *ইলিয়াড*-

এর আরম্ভ ঘটায়। এটুকুই। আর কিছুই বললেন না হোমার তাঁর প্রধান নায়ককে বিদায় দেওয়ার সময়ে। শুধু তৃতীয়-পুরুষের কথক হিসেবে তিনি, সাংবাদিকের মতো করে, আমাদের কাছে রিপোর্ট পেশ করলেন যে অ্যাকিলিস ব্রাইসিয়িসকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু যেহেতু মেয়েটি *ইলিয়াড*-এর যাবতীয় রক্তপাত ঘটানোর পেছনের কারণ সেই প্রথম পর্বের ব্রাইসিয়িসই, তাই কত না বলা কথা এখানে পাঠকের জন্য উহ্য রেখে দিলেন হোমার।

আর হোমারের অবজেকটিভিটি (বস্তুনিষ্ঠতা) বিষয়ে এটাও বলতে হয় যে— ক্যামেরার উদাহরণ টেনেই বলছি— তিনি এ-অর্থে সাবজেকটিভও যে তিনিই— অন্য কেউ নয়— ঠিক করেন তার ক্যামেরা কোন্ কোন্ দৃশ্যের উপরে ঘুরবে, কোন্ অ্যাঙ্গেল থেকে দৃশ্যটা দেখবে, কোথায় ও কিসের ওপরে ফোকাস করবে। হোমার শুধু এটুকুই করেন, তিনি সে দৃশ্যের মূল্যায়ন পেশ করেন না কোনো। তিনি শুধু আমাদেরকে বলে যান, বা আমাদের কাছে রিপোর্ট করে যান; কিন্তু ব্যাখ্যা করার দায়িত্বটা ছেড়ে দেন পাঠকের বা শ্রোতার হাতেই। তৃতীয়-পুরুষের কথক হয়েও এই যে দৃশ্য বা চরিত্র বা ঘটনার মূল্যায়নে অংশ না নেওয়া, এটা কোনো সাহিত্যিকের জন্য যে কত বড় এক গুণের কথা তা সাহিত্য বিষয়ে আগ্রহী যে কেউ বুঝবেন। এখানেই হোমার ভার্জিল, দান্তে, শেকস্‌পিয়ার ও মিলটন থেকে আলাদা, অনেকটা এ-যুগের উত্তরাধুনিকদের মতো— তিনি কখনোই আপনাকে বলছেন না যে কোন্‌টা ঠিক কাজ, আর কোন্‌টা বেঠিক; কোন্‌টা ন্যায়সঙ্গত আর কোন্‌টা অন্যায়। যেমন তিনি বলছেন, অডিসিয়ুস হাজার-চাতুরিতে ভরা ধূর্ত এক লোক; কিন্তু ওটুকুই। এটা তার অডিসিয়ুসের মূল্যায়ন নয়, বরং লোকে অডিসিয়ুসকে নিয়ে যা বলে, স্রেফ তার রিপোর্টিং। এখন *ইলিয়াড* পড়ে এ-সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব কেবলই আপনার যে, অডিসিয়ুস সত্যি অমন এক লোক কি-না। *ইলিয়াড*-এ ভাষণ বা বক্তৃতাও হোমারের কাব্যশৈলীর এক উল্লেখযোগ্য দিক, যেমন তাঁর মহাকাব্যিক উপমাগুলো (epic simile)। বীরের বীরত্বে ভরা মহাকাব্য হাতে নিয়েই আমরা ধারণা করে বসি যে এটা নিশ্চয়ই ভরা থাকবে সেইসব বীরের বহু বীরত্বব্যঞ্জক অ্যাকশন দিয়ে। কিন্তু না। *ইলিয়াড*-এর চল্লিশ শতাংশই বক্তৃতা বা ভাষণে ভরা। প্রায় ৬৬৬টি বক্তৃতা আছে এই মহাকাব্যে; আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, অ্যাকিলিস এ মহাকাব্যের অর্ধেকের বেশি অংশে অনুপস্থিত আছে ঠিকই, কিন্তু আমরা তার কণ্ঠই শুনেছি অন্য যে কারো থেকে বেশি। অর্থাৎ অ্যাকিলিসের বলা কথার (বা বক্তৃতা/ভাষণের) দৈর্ঘ্য অন্য যে কারো অধিক। কিন্তু মোট ভাষণসংখ্যার পরিসংখ্যানই সব নয়, ভাষণগুলোর তীব্রতাও এক বড় বিচার্য বিষয়। হেক্টরের স্ত্রী অ্যান্ড্রোমাকি এখানে কথা বলে চারবার মাত্র, কিন্তু তার সবকটাই ঘটে মানবিক আবেগের উত্তুঙ্গ মুহূর্তে। আর ব্রাইসিয়িস কথা বলে মাত্র একবারই, প্যাট্রোক্লাসের লাশের পাশে বসে, কিন্তু মাত্র চৌদ্দ লাইনের তার সেই বক্তৃতায় সে আমাদেরকে দিয়ে যায় এক অবিশ্বাস্য বিলাপগাথা। প্রতিটা বক্তৃতাই *ইলিয়াড*-এ, কম-বেশি, নতুন নতুন এক জীবনসত্য তুলে ধরে। *ইলিয়াড*-এর এই বক্তৃতাগুলোই এ কবিতাটির মনস্তাত্ত্বিক ওজনকে ধরে রাখে। হোমার তৃতীয় পুরুষের কথক হিসেবে কোনোকিছুরই মূল্যায়নে আগ্রহী নন, এমনকি কারও কোনো বক্তৃতারও। তবে

বক্তৃতার মধ্যে বক্তারা ঠিকই অন্যের চারিত্রিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন পেশ করে। কথক ও বক্তা মিলে, এভাবেই, কোনো বিষয়ের ওপর আলো ফেলে অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ, দুই ভঙ্গিমাতেই। আজও তৃতীয়-পুরুষের কথন ভিত্তিক উপন্যাসগুলোতে ঔপন্যাসিকেরা হোমারের এই শৈলীকেই সবচেয়ে কাজের বলে মানেন। হোমারের শক্তি এখানেই যে তৃতীয়-পুরুষের কথক হিসেবে তিনি সবকিছু দেখছেন, মানুষ বা দেবদেবী যে-ই হোক না কেন সবার মস্তিষ্কের ভেতরেই ঢুকে যেতে পারছেন, পুরো পরিস্থিতির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে পারছেন, কিন্তু নিজে তিনি অবস্থান করছেন মহাকাব্যটি থেকে অনেক দূরে; কঠোর নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত, নৈর্ব্যক্তিক এক ভঙ্গি সেটা। সবকিছুর মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা অতএব যেহেতু পুরো আমাদেরই হাতে, আমরা তাই *ইলিয়াড* পাঠ করার শেষে ঠিকভাবে বলতেও পারি না যে, *ইলিয়াড*-এর মূল নীতিকথাটা কী? কিংবা অ্যাকিলিস, বা কোনো যুদ্ধদৃশ্য, বা হেলেন চরিত্রটার মাধ্যমে হোমার আমাদেরকে আসলে কী বলতে চেয়েছেন? ব্যাখ্যার দুয়ার এভাবেই অবারিত করে রেখে দিয়েছেন হোমার। *ইলিয়াড*-এ যুদ্ধদৃশ্য আছে এ মহাকাব্যের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে— এর মোট ১৫,৬৯৩ লাইনের মধ্যে যুদ্ধই নিয়ে নিয়েছে ৫,৫০০ লাইন। মোট তিনশ যুদ্ধ আছে এ বইয়ে, যার মধ্যে আবার দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা বীরে-বীরে একক লড়াই আটাশটি। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধগুলোতে দেখা যায় দুই বীর নিজেরা নিজেরাই রাজি হয়েছে শুধু দুজনে মুখোমুখি লড়বে বলে। হোমারের বর্ণনাশৈলীর এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এই যে, এতগুলো যুদ্ধদৃশ্যের *ইলিয়াড*-এ আমরা দেখি না যে কোনো যোদ্ধাই দীর্ঘক্ষণ যাবত একটানা মানুষ হত্যায় ব্যস্ত, শুধু ব্যতিক্রম প্যাট্রোক্লাস ও অ্যাকিলিস। আর যোদ্ধাদের মূল যুদ্ধকৌশল হচ্ছেঃ মারো, তারপর ভাগো (hit and run)। তার মানে, তারা যুদ্ধে শহিদ হওয়ার জন্য উন্মুখও নয়, বেপরোয়াও নয়। আর যুদ্ধ মানেই যেহেতু রক্তপাত ও মৃত্যু, তাই আমাদের ধারণা জাগে যে, হোমার নিশ্চয়ই এসব নির্মম দৃশ্যের বারবার বর্ণনা দিতে গিয়ে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, বিশাল আবেগমথিত কোনো মন্তব্য করে বসবেন বুঝি তিনি। না, এসবের ধার-কাছ দিয়েও যান না হোমার। যুদ্ধের নির্মমতা ও মৃত্যুর থাবাকে তিনি ফুটিয়ে তোলেন ঠিক সেই সংবাদপত্রের রিপোর্টারের মতো, কিংবা—এখানেই হোমারের নির্লিপ্ততার সবচেয়ে বড় প্রমাণটি হাজির— কোনো চিকিৎসকের মুখে রোগীর আহত অবস্থার (বা পোস্টমর্টেম রিপোর্টের) বয়ান আউড়ে যাবার মতো করে। এটা এক ভয়ংকর বিপদজনক পৃথিবী— ট্রোজান সমতলে মানুষ নামের একদল পশু আরেকদল পশুকে চেপে ধরেছে। এতখানি বিপদজনক পৃথিবীতে সেন্টিমেন্টালিটির বা মেলোড্রামার কোনো স্থান নেই; অসংখ্য মৃত্যুর পুনঃপৌনিকতা সব সেন্টিমেন্টালিটি ও মেলোড্রামাকে ধুয়ে-মুছে দিয়েছে। হোমারের বাক্যশৈলী বিষয়ে শেষ কথাটা বলতে হয় *ইলিয়াড*-এর এই কবির সবচেয়ে পাঠকপ্রিয় প্রকরণটি নিয়ে— সিমিলি বা মহাকাব্যিক উপমা। পুরো *ইলিয়াড*-এ আছে মোট তিনশরও অধিক সিমিলি, আর তারা দখল করে আছে এর ১,১০০ লাইন (অর্থাৎ পুরোর ৭ শতাংশ)। আমরা 'পাঠ-পর্যালোচনা' অংশে এগুলো নিয়ে বেশ খানিকটা আলোচনা করেছি। এখানে শুধু এটুকুই বলব যে, *ইলিয়াড*-এ যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরের সেই প্রাচীন গ্রিক প্রকৃতি ও সমাজকে আমাদের চোখের সামনে হাজির করেছে হোমারের এই অত্যাশ্চর্য

সিমিলিগুলোই। প্রাকৃতিক পৃথিবী— আসমানের তারা, বনের সিংহ, দুধের বালতিতে বসা মাছি, দাঁতাল শূকর, শিকারিদের দল ও কৃষকেরা— নানা রূপে, নানা বর্ণ, গন্ধ ছড়িয়ে হাজির হয়েছে এই ১,১০০ লাইনে, পুরো মহাকাব্য জুড়ে। এই সিমিলিগুলো হোমারের বর্ণনা করা কোনো ঘটনা, কোনো সিদ্ধান্ত বা কোনো চরিত্রের কোনো কাজকে আরও তীব্রতা ও জোরের সঙ্গেই শুধু ফুটিয়ে তোলেনি, এগুলো *ইলিয়াড*কে একইসাথে তুলে নিয়ে গেছে ট্রোজান সমতলের বাইরে, একে স্থাপন করে দিয়েছে শাশ্বত মানবসমাজের ও প্রাকৃতিক বিশ্বজনীন আবহমানতার দোরগোড়ায়।

শেষ কথা—কেন হোমার গুরুত্বপূর্ণ?

আজকের দিনে কল্পনা করা অসম্ভব এমন এক দৃশ্যকে কল্পনা করে নিতে পারি আমরা। বহু বহু কাল আগে, গ্রিসের ইয়ুবিয়া দ্বীপে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যোগ দেওয়া ইয়ুবিয়ার ব্যবসায়ী মহলে—যাদের কাছে প্রথম পৌঁছেছিল বর্ণমালাভিত্তিক লিখনকৌশলের পদ্ধতি— আমরা ধরে নিচ্ছি কোনো এক শিলাখণ্ডের ওপর বসে এক কবি তাঁর লিপিকারের কাছে বলে যাচ্ছেন তাঁর দুই দীর্ঘ মহাকাব্য, লাইন-বাই-লাইন *ইলিয়াড* ও *অডিসি*। এই কাজ চলছে মাসের পর মাস, হতে পারে বছরের পর বছর ধরে। লিপিকার তখন প্যাপিরাসের স্ক্রলে তা-ই তুলে নিচ্ছেন যা মুখে বলছেন কবি, আর তিনি কী লিখছেন তা কীভাবে পড়তে হয় সেটা জানেন না এই কবি, জানে না আশেপাশের আর কেউই।

হোমারের মৌখিক বা বাচনিক মহাকাব্য দুটোর বিষয়ে উপরের এই অনুমান হয়তো সত্য। কিন্তু কবির জন্য কী দুর্বিষহ এক কাল সেটা: না আছে কোনো লাইব্রেরি, না কোনো পাঠক, না কোনো কিছুর লিখিত কোনো দলিল-দস্তাবেজ-তথ্য, শুধু আছে হোমারের দুই মহাকাব্য, আর পরে হেসিয়ড। এঁরাই ছিলেন প্রথমে এক ছোট এলিট শ্রেণির ইয়ুবিয়ান মানুষদের গবেষণার ও কৌতূহলের দুই বস্তু, যাঁদের নিয়ে গবেষণাকারীদের সংখ্যা পরে বেড়েই চলল ততো বেশি হারে যত বেশি বর্ণমালাভিত্তিক লিখনের নিয়মকানুন ছড়িয়ে যেতে লাগল এলিট থেকে নন-এলিট শ্রেণির দিকে। এদেরই কেউ কেউ পরে প্যাপিরাস স্ক্রল দেখে দেখে মহাকাব্যদুটোর বড় কিছু অংশ মুখস্থও করে ফেলল উৎসব-অনুষ্ঠানে অতিথিদের বা নিজের পিতা-মাতা-পরিজনকে মুগ্ধ করবে বলে। গরিব চারণকবিদের কাব্যকলা এভাবে ঢুকে গেল বড়লোকের বাড়িতে, প্রাসাদে; মাঠেঘাটের হোমার এভাবে জায়গা পেতে লাগলেন ধনী মানুষদের উৎসব-অনুষ্ঠান থেকে নিয়ে একসময় গবেষকের টেবিল হয়ে লাইব্রেরি পর্যন্ত, এবং অতি অবশ্যই শিশু-কিশোরদের বিদ্যায়তনে এবং এক পর্যায়ে বয়স্ক মানুষদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়। হোমারের সময়ে, প্রথমদিকে, ইয়ুবিয়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যোগ দেওয়া সম্পদশালী মানুষেরাই ছিল হোমারের জন্য এলিট শ্রেণি। পুবের পৃথিবীতে সাক্ষরতা— একগাদা চিহ্ন বা প্রতীককে মুখের কথার সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়ে কোথাও বসিয়ে দিতে পারার ক্ষমতা, তা পাথরে হোক, চামড়ার ওপরে হোক, আর প্যাপিরাসেই হোক— ছিল শুধুমাত্র লিপিকার শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ; আর এই লিপিকাররা ছিল বিশেষজ্ঞ গোত্রের মানুষ যারা তাদের পুরো জীবন উৎসর্গ করে দিত চিহ্নভিত্তিক (symbol) লেখালেখি বা

খোদাই পদ্ধতিকে বুঝতে। পুবে এরাই ছিল এলিট শ্রেণি, আর এদের ক্ষমতা ও প্রাচুর্য আরও বেড়ে গিয়েছিল কারণ লিখনপদ্ধতির একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল শুধু তাদেরই হাতে। গ্রিসে ঘটল ঠিক এর উল্টোটা। লিখনপদ্ধতি বা সাক্ষরতা চলে গেল শৌখিন মানুষদের হাতে, যারা কোনোভাবেই ধনী নয়, কোনোভাবেই সমাজের ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে জড়িত কেউ নয়। গ্রিসে এই নির্ধনী সাক্ষর মানুষদের হাত থেকেই হোমার পরে ঢুকেছিলেন ধনীর প্রাসাদে; আর পুবে তা ধনীর প্রাসাদ থেকে পরে গিয়েছিল ধনহীনের হাতে। গ্রিসের এই শৌখিন সাক্ষরদের ছিল অন্য আরেক নেশা— কবিতার, কোনোভাবেই ব্যবসা-বাণিজ্যের নয়। আমরা যতদূর জানি, গ্রিক বর্ণমালাভিত্তিক লিখনপদ্ধতি কোনো বাণিজ্যের বা ব্যবসায়ের কাজে লাগেনি প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সাল অবধি; অর্থাৎ এর আবিষ্কারের প্রথম দুশো বছর এটা শুধু কাব্যদেবীর প্রতি নিবেদনই রেখে গেছে। তেমনই সাক্ষ্য দেয় গ্রিসের গুহাগাত্রের নানা খোদাইকর্ম, নানা শিলালিপি।

তবে আমাদের অবাক লাগে, চারণকবিদের মাঠ-ঘাট থেকে না হয় হোমার প্রাসাদে ঢুকলেন, কিন্তু তিনি 'ক্ল্যাসিক' হলেন কীভাবে, সে কথা ভেবে। তাঁর কবিতা দুটো অনেক বেশি লম্বা, আর মাঝেমধ্যেই সেখানে গল্পের ধারাবাহিকতার সুতো হাতে ধরে রাখাটাই মহা ঝামেলার; তাঁর কাহিনীর চরিত্রসংখ্যা অসম্ভবরকমের বেশি; তাঁর উপমাগুলো প্রায়শই অদ্ভুত ও বুনো; তাঁর চরিত্রের ভাষণের মধ্যে প্রায়শই আবেগের ফেটে পড়া; আর তাঁর আছে রক্তপাত ও নরহত্যাদৃশ্যের প্রতি একধরনের মোহ। আমাদের মনে হয়, অন্য সব যদি বাদও দিই, তবু তো স্রেফ দৈর্ঘ্য এবং কাহিনীর ভাষাগত ও চরিত্রের বিশাল সংখ্যাগত জটিলতার কারণেই হোমারের কখনও 'ক্ল্যাসিক' হয়ে ওঠা যুক্তিযুক্ত ছিল না। কিন্তু তা-ই হয়ে উঠলেন তিনি— পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম 'ক্ল্যাসিক' লেখক বা কবি। বাইবেলের পরেই পশ্চিমা বিশ্বে সর্বাধিক পঠিত, সর্বাধিক আলোচিত টেক্সট হোমারের এই *ইলিয়াড* ও *অডিসি*। কেবলমাত্র হোমারের নিজের মহত্ত্ব, আর হঠাৎ করে একদিন গ্রিক বর্ণমালার উদ্ভব যার কারণে তাঁর এই সুদীর্ঘ সৃষ্টি দুটি টিকে গেল— এ দুই কারণই ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে হোমারের 'ক্ল্যাসিক' হয়ে ওঠার আপাতদুর্বোধ্য সত্যটার পেছনের কারণ।

পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াতেই আছেন হোমার। পশ্চিমে আজও কোনো মানবসন্তান একটু বড় হয়ে প্রথম যে বইটি হাতে নেয় তা হোমারেরই লেখা। আর আজও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পশ্চিমা সভ্যতা বিষয়ক কোনো কোর্সের একেবারে শুরুতে থাকেন হোমার; তারপর সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টোটল। এই ধারাক্রম আজও বহমান, এবং আমাদের অনুমান যে ব্যাপারটা এমনই থাকবে অনন্তকাল ধরে। গ্রিক বর্ণমালার একদিন উৎপত্তি হল, চল হল বর্ণমালাকেন্দ্রিক লিখনশৈলীর, আর লিখে ফেলা হল হোমারের কবিতা— এটাই পশ্চিমা বিশ্বের ইতিহাসের কোনো একক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, অন্তত ইতিহাসবেত্তা, প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাষাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানের গবেষকদের কাছে; যদিও জর্জ স্টাইনারের মতো বড় পণ্ডিতের অভিমত যে, পশ্চিমের শিক্ষিত যে কারো কাছেই।[৩৭] সে কারণেই হোমার আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

জর্জ স্টাইনার আবার এই গুরুত্বের বিশদ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শেষে বিষয়টাকে নিয়ে গেছেন অন্য এক উচ্চতর স্তরে। তিনি তাঁর 'Homer and the Scholars' প্রবন্ধের শেষে লিখেছেন: '*ইলিয়াড* ও *অডিসি* আমাদের কাছে থেকে গেছে এক অনতিক্রম্য সত্য হিসেবেই। আর যদিও অনেক বই আছে যেগুলোর অনুসরণে মানুষ তাদের জীবনকে সাজিয়েছে, তবু আমার ধারণা যে হোমারের মহাকাব্য দুটোর বাইরে অন্য কোনো বই নেই যা আমাদেরকে এত বেশি করে মানুষের মরণশীলতার অনিবার্য হিসাবনিকাশকে সহ্য করে যাবার ক্ষমতাটুকু দেয়।'[৩৮] মৃত্যু নামের অনিবার্য ও নিশ্চিত সত্যটার মুখোমুখি হবার সাহস অর্জন করার জন্যই, তাহলে, হোমার গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থসূত্র

১. দেখুন Martin Hammond, *Homer—The Iliad* (পেঙ্গুইন বুকস্, ১৯৮৭; ভূমিকা, পৃ: ারর)।

২. ঐ।

৩. দেখুন Harold Bloom's Introduction, *Homer's Iliad* (চেলসি হাউজ পাবলিশার্স, ২০০৭, ভারতীয় সংস্করণ, পৃ: ৫)।

৪. ঐ (পৃ. ৬)।

৫. দেখুন Alberto Manguel, *Homer's The Iliad and The Odyssey* (আটলান্টিক বুকস্, ২০০৭; পৃ: ১)।

৬. ঐ।

৭. প্লেটোর *Lesser Hippias* থেকে (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৯৯ সন)।

৮. J. W. von Goethe, *Letters to Schiller*, ২৭ ডিসেম্বর ১৭৯৭।

৯ . ঐ।

১০. উপরের ৫নং ক্রমিকের বইটি; পৃ: ১৫৮।

১১. অ্যারিস্টোটলের *Poetics* থেকে (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ সন)।

১২. লন্‌জাইনেসের প্রবন্ধ 'On the Sublime' থেকে; অনুবাদ ড. Rhys Roberts (১৮৯৯)।

১৩. Georgc Steiner, *Homer in English* (পেঙ্গুইন বুকস্, ১৯৯৬)-এর ভূমিকা অংশ।

১৪. উপরে ৫নং ক্রমিকে উল্লিখিত Alberto Manguel; পৃ: ৯৪।

১৫. Francesco Petrarca, Familiarum Rerum, XVIII: ২ (আলবার্তো ম্যাঙ্গুয়েলের বইটিতে উল্লিখিত)।

১৬. Jacob Burckhardt, *The Civilization of the Renaissance in Italy* (র‍্যান্ডম হাউস, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৪)।

১৭. Nicholas Boyle, *Goethe—The Poet and The অমব* (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯২)।

১৮. উধারফ Luke-এর ভূমিকা; গ্যেয়টের *ফাউস্ট, দ্বিতীয় খণ্ড* (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৪)।

১৯. ঐ।
২০. Rupert Brooke, *The Collected Poems* (WW, মিড অ্যান্ড কোং, ১৯২৩) বইটির ভূমিকা থেকে।
২১. Christopher Marlowe, *Doctor Faustus*, পঙ্‌ক্তি ১৩৫৪-১৩৫৬।
২২. এডগার অ্যালান পো'র কবিতা : 'To Helen'|
২৩. প্লেটো, *Ion*; *Collected Dialogues of Plato* থেকে (প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৩)।
২৪. Stanley Lombardo, *Iliad—Homer* (হ্যাকেট পাবলিশিং কোং, ১৯৯৭); বইটির 'অনুবাদকের মুখবন্ধ' অংশ।
২৫. Elton Barker I Joel Christensen, *Homer—A Beginner's Guide* (ওয়ান-ওয়ার্ল্ড বুক, ২০১৩)।
২৬. Mustafa El-Abbadi, *Life and Fate of the Ancient Library of Alxandria* (প্যারিস, ইউনেস্কো, ১৯৯০)।
২৭. Herodotus, *The Histories* (পেঙ্গুইন বুকস্, লন্ডন, ১৯৫৪); পর্ব ২, অধ্যায় ১১৭।
২৮. F. Zeitlin, *Being Greek Under Rome* (কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০১)।
২৯. J. Haubold, *Homer's People*: *Epic Poetry and Social Formation* (কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০০)।
৩০. Bruce Heiden, *The Placement of Book Divisions in the Iliad* (Journal of Hellenic Studies, 1994)।
৩১. T. E. Lawrence, *The Odyssey of Homer* (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৬); 'অনুবাদকের কথা' অংশ থেকে।
৩২. Albert B. Lord, *The Singer of Tales* (হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬০)।
৩৩. Alberto Manguel, উপরের ক্রমিক নং ৫-এর বইটি; পৃ: ৩৪।
৩৪. Thomas De Quincy, 'Homer and the Homeridae', *The Works of Thomas De Quincy* (পিকারিং অ্যান্ড শ্যাটো, লন্ডন, ২০০১-০৩)।
৩৫. উপরের ক্রমিক নং ৩২-এর বইটি।
৩৬. উপরের ক্রমিক নং ২৭-এর বইটি।
৩৭. সম্পাদনা George Steiner & Robert Fagles, *Homer – A Collection of Critical Essays* (প্রেন্টিস হল ইনক্, ১৯৬২)।
৩৮. ঐ।